নকশালবাড়ির পঞ্চাশ বছর

বিপ্লবভূমি এখন চিনা সামগ্রীর স্মাগলিং করিডর

কোচবিহারের সঙ্গে রবি ঠাকুরের যোগাযোগ ছিল রাজ পরিবারের বাইরেও

উত্তরের মাটিতে মাশরুম বিপ্লব চান দিব্যেন্দু

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর দরবার

এখন ডুয়ার্স

১ অগাস্ট ২০১৬। ১২ টাকা

বারবার বিপর্যস্ত ডুয়ার্স কোনও স্থায়ী সমাধান নেই ?

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

তৃতীয় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা
১ অগাস্ট ২০১৬

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৪
ডাকে ডুয়ার্স
নকশালবাড়ির পঞ্চাশ বছর
একবার ফিরে দেখা ৮
দূরবিন
একদা মাও অনুপ্রাণিত নকশালবাড়ি আজ
চোরাই চিনা সামগ্রী পাচারের করিডর ১৪
একটি অনিচ্ছুক বিদায়
ঘুঙুর দাদু মাপ করে দিও আমাদের ১৮
উন্নয়ন মন্ত্রীর দরবার ১৯
বাইশে শ্রাবণ স্মরণে
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোচবিহারের যোগাযোগ
ছিল রাজ পরিবারের বাইরেও ২২
উত্তরের উজ্জ্বল মুখ
ডুয়ার্সের মাটিতে মাশরুম বিপ্লব
চান দিব্যেন্দুকান্তি ২৬
প্রতিবেশীর ডুয়ার্স
চোরাচালান অবাধেই ঃ
হিলি আছে হিলিতেই ২৯
রবির আলোয় কি কুলিক পক্ষীনিবাসের
দুর্দশা ঘুচবে? ৩০
স্মৃতির ডুয়ার্স
সেই দিনগুলি ছিল আমাদের ডুয়ার্সের
মাটি দখলের লড়াই ৪৬
স্বাস্থ্য ভাবনা ৫০
পর্যটনের ডুয়ার্স ৪৮
নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৬
খেলাধুলায় ডুয়ার্স ২৮
প্রহেলিকার ডুয়ার্স ২৮
বিচিত্র মানুষের সচিত্র ডুয়ার্স ৪০
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৪১
বইপত্রের ডুয়ার্স ৪৩
ধারাবাহিক ডুয়ার্স
তরাই উৎরাই ৩২
লাল চন্দন নীল ছবি ৩৪
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ৩৭
শ্রীমতী ডুয়ার্স
এবারের শ্রীমতী ৪৪
শখের বাগান ৪৪
ভাবনা বাগান ৪৭

খটখটে হাতিনালা ছিলি বেশ শুকিয়ে
শহরের মাঝখানে মুখখানা লুকিয়ে
বিষ আর বিষ নিয়ে বুকখানা ভরিয়ে
বালু আর প্লাস্টিকে সারা দেহ জড়িয়ে!

চামুর্চি পাহাড়ের কী যে হল খেয়ালে
এত মেঘ ডেকে আনে খাড়া ওই দেয়ালে
ঝরো-ঝরো ঝরঝর অফুরান বৃষ্টি
ঘোলা হয়ে যায় দেখি পাহাড়ের দৃষ্টি!

জল যেন অজগর হাতিনালা ভাসল
বানারহাটের দিকে ফোঁস তুলে আস্‌লো
দোষ কার কে বা জানে, রোষ বাড়ে কার যে
বাধা পেয়ে ক্ষিপ্ত, আকাশও যে গর্জে!

চা-বাগান উপড়াল, ভেসে যায় বস্তি
চুরমার রাস্তায় বাড়ে অস্বস্তি
একটানা বৃষ্টির পদাবলি শুনছি
ধ্বংসের স্রোতগুলো দুই হাতে গুনছি!

বেনো জলে এ ডুয়ার্স মাথা কুটে মরছে
অবিরাম বরিষন দিনরাত ঝরছে!

ছন্দে- অমিত কুমার দে
ছবিতে- সায়ন ভদ্র

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
প্রধান চিত্রগ্রাহক অমিতেশ চন্দ
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল- ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

ডুয়ার্সের
কফি হাউস
এখন
জলপাইগুড়িতে

লাগাতার আড্ডা
গ্রুপ বৈঠক/সেমিনার
টিভিতে ম্যাচ দেখা
বাংলা-ইংরাজি পত্র-পত্রিকা
এবং গরম চায়ের মৌতাত

আর কী চাই?
বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা
রবিবার বা অন্য ছুটির দিনেও স্বাগত জানাই

আড্ডাঘর
মুক্তা ভবনের দোতলায়
মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি
facebook.com/
aaddaghar

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

কোচবিহার রাজ্যের মাথাভাঙা মহকুমার খলিসামারী গ্রামে ১৮৬৫ সালে তাঁর জন্ম। পঞ্চাননের নেতৃত্বে ১৩১৭ সালের ১৮ জ্যৈষ্ঠ রংপুরে ক্ষত্রিয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি তার সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর প্রচেষ্টায় রংপুর জেলা স্কুলে রাজবংশী ছাত্রদের জন্য ক্ষত্রিয় ছাত্রাবাস এবং রাজবংশীদের সাহায্যের জন্য কুড়িগ্রামে ক্ষত্রিয় ব্যাংক স্থাপিত হয়। অনুন্নত রাজবংশীদের মধ্যে অধিকার সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি ক্ষত্রিয় পত্রিকা নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারি চাকরিতে অধিকহারে স্বজাতি নিয়োগের প্রচেষ্টা চালান। তারই অনুপ্রেরণায় রংপুর জেলা আদালতে বহু রাজবংশী আইনপেশায় নিয়োজিত হন।

পঞ্চানন বর্মা তাঁর আইনপেশার পাশাপাশি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। তিনি ১৯২০, ১৯২৩ ও ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। মৃত্যু ১৯৩৫।

জলপাইগুড়ি পুরসভা তাঁর অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে তাঁর মূর্তিটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পুনঃস্থাপন করেছে। মা-মাটি-মানুষ ভূমিপুত্রদের ভোলে না।

শ্রীমতি পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

বারবার বিপর্যস্ত ডুয়ার্স স্থায়ী সমাধান নেই?

আগাম আভাস ছিলই এবছর ভারী বর্ষণের। বন্যার আশঙ্কায় মন্ত্রী-আধিকারিকদের জরুরি বৈঠকও বসেছিল সময় মতো। কিন্তু এতে সমাধান কিছু হয়নি। প্রবল বর্ষণে নদী-উপনদী-শাখা নদী উপচে জল ভাসিয়ে দিল ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। প্রথমবার কোনও মতে রক্ষা হলেও দ্বিতীয়বার আর হয়নি। বিপুল ক্ষতি হল ধান ও মাছ চাষের। আর মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতোই বিপর্যস্ত হল রুগ্ন চা বলয়।

নেতা-মন্ত্রীরা এসময় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন যাঁরা ভোট দেন তাঁদের পাশে দাঁড়াতে। কাউকে কাউকে দেখা গিয়েছে হাঁটু জলে খিচুড়ি পরিবেশনে ব্যস্ত, কেউ ত্রাণ পাঠাতে দিবারাত্রি পরিশ্রম করে চলেছেন, কেউ সপারিষদে নৌকায় চেপে বন্যাবিহারে, কেউ আবার প্রশাসনের সঙ্গে দলীয় নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে ত্রাণকার্য ত্বরান্বিত করছেন। সব মিলিয়ে এবারও প্রবল পরাক্রমে নিজেদের উপস্থিতি জাহির করেছেন শাসকগোষ্ঠী, অথচ বিরোধীরা পরাজয়-গ্লানি ঘোচাবার মোক্ষম সুযোগ পেয়েও জেগে উঠতে পারলেন না।

এবারের বন্যায় ডুয়ার্স চা-বাগানগুলির অভাবনীয় ক্ষতির আন্দাজ এখনও পাওয়া যায়নি। তবে সদ্য তৈরি হওয়া চা-ডাইরেক্টরেট যে গোড়াতেই ভাল চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে তা অনুমান করা যাচ্ছে সহজেই। চা-বাগানের ক্লিষ্ট মুখগুলোতে সত্যিই কিঞ্চিৎ হাসি ফোটানো যায় কিনা— সেই প্রত্যাশাতেই তাকিয়ে আছে গোটা ডুয়ার্স।

দুর্যোগ এবারের মতো কেটে গিয়েছে বলে কোনও আশার বাণী এখনও শোনাতে পারেননি আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। বরং বলা যায়, বর্ষা ঋতুর মধ্যপথেই রয়েছি আমরা। ফের বর্ষণ, ফের বানভাসির শঙ্কা এখনও থেকেই যায়। এরই মধ্যে এনসেফেলাইটিসের মতো রোগের গেরিলা আক্রমণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যদিও যুগে যুগে এসব গা সওয়া হয়ে গিয়েছে ডুয়ার্সের শান্তিপ্রিয় মানুষগুলির। তবু তাদের মনের মেঘ-গোমড়া আকাশের এক কোণে ভরসার রোদ বোধহয় উঁকি মারে— বহু বহু দিন বাদে উত্তরের গুরুত্ব বেড়েছে রাজ্যের শাসক মহলে, জনপ্রতিনিধিদেরও এত উদ্যোগ আন্তরিকতা আগে দেখা যায়নি। বছরের পর বছর এই অনিবার্য দুর্গতি থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনও স্থায়ী পথ কি নেই?

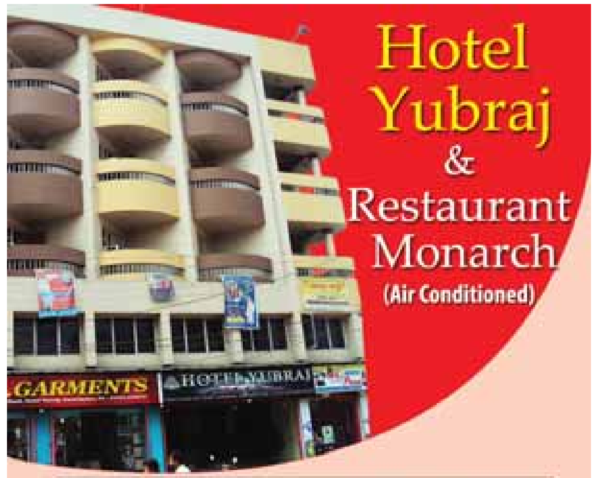

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC)	Rs 650	900
Deluxe AC	Rs 990	1200
Super Deluxe AC	Rs 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs 2000	2000
Suite	Rs 3000	3000
VIP Suite	Rs 3500	3500
Extra Occupancy on (Non AC)	Rs 100	---
Extra Occupancy on (AC)	Rs 200	---

N.B. Tax as per applicable

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

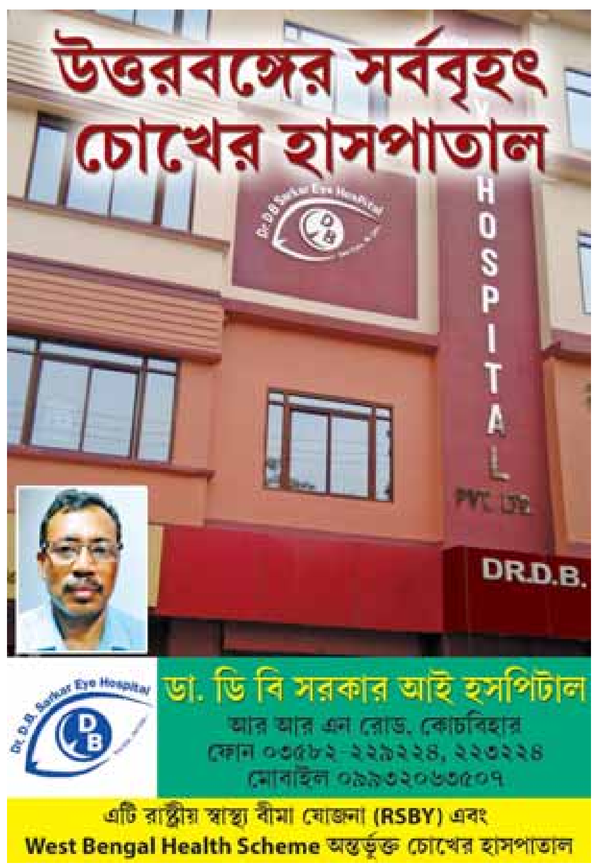

কলকাতায় উৎসবের উন্মাদনা

দুর্গাপুজোর চারটে দিনে কলকাতার চেহারাই পাল্টে যায়। আট থেকে আশি, সকলেই তখন উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা। সাবেক চালচিত্রে বনেদী বাড়ির পুজো বা থিমের সাজে সেজে ওঠা বারোয়ারি প্যান্ডেল, রাতভোর রাস্তায় মানুষের ঢল আর রঙিন আলোয় মোড়া শহর - উৎসবের উন্মাদনা কাকে বলে, তা জানতে পুজোর কলকাতায় আপনাকে আসতেই হবে।

EXPERIENCE Bengal

THE SWEETEST PART OF INDIA

DEPARTMENT OF TOURISM,
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

www.wbtourism.gov.in/www.wbtdc.gov.in www.facebook.com/tourismwb
www.twitter.com/TourismBengal +91(033) 2243 6440, 2248 8271

Download our app Google play

খুচরো ডুয়ার্স

আলোয় ‘ঢাকবে’ পুরসভা

‘আলোকের এই ঝরনাধারায় ধুইয়ে দাও।’ ধুয়ে যাবে ময়নাগুড়ি শহর এবার আলোর বন্যায়। আলোর জল ছেড়ে এই প্লাবন ঘটাবে এসজেডিএ। দিকে দিকে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে যে আলো আসছে! ময়নাগুড়ি শহরে ১০টি হাইমাস্ট ল্যাম্প এবং এই ব্লকেরই বিভিন্ন এলাকাতে আরও ১০টি হাইমাস্ট ল্যাম্প লাগানো হচ্ছে শিগগির! তাহলে ১০ দু’গুণে ২০! এ যে ভূরি ভূরি আলো আসতে চলেছে গো! মহালয়ার ভোরে ‘বাজল তোমার আলোর বেণু’ বাজার আগেই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে ময়নাগুড়ি। কিন্তু দুর্জন পাবলিকের তো অভাব নেই। তারা খালি বলছে যে, আলোর বন্যায় ‘পুরসভা’র ইস্যুটা ভেসে যাবে না তো!

ওষুধ থাক, পথ্য খাক

সে দিন কানে এল, রথযাত্রা ও ইদ উপলক্ষে নাকি জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রুগিরা স্বাদ বদল করেছে। তবে

চিকিৎসায় নয়, ভোজনে। মেনুতে নাকি ভারী রদবদল। একেবারে এলাহি না হলেও ইস্পেশাল ডাল, মুরগির মাংস, সয়াবিনের তরকারি, পাঁপড় ভাজা, মায় রথযাত্রায় প্রসাদ হিসেবে জিবেগজাও মিলল রুগিদের থালে থালে। তা ভাল কথা কর্তা! হাসপাতালে তো বদ্যি বাড়ন্ত। মাঝে মাঝে এমন খাদ্যচিকিৎসা করলে রুগিরা ডাক্তারের আশায় চিৎপাত হয়ে অন্তত গাইতে পারবে, ‘আমি খেয়ে খেয়ে থাকি সারাদিন।’ আগে তো পথ্য খাক, পরে না হয় বদ্যি মিলবে, ওষুধ খাবে।

সাপগ্রস্ত

‘বাবুরাম সাপুড়ে, কোথা যাস বাপু রে, আয় বাবা দেখে যা, দুটো সাপ রেখে যা’— সেই রেখে যাওয়া দুটো সাপ একসঙ্গে না হলেও একাই ঘটিয়ে ফেলল কাণ্ড। শিলিগুড়ি ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের এক গৃহস্থ বাড়িতে সে হয়ত ঘরকন্না করতেই গিয়েছিল, কিন্তু কোনও উটকো ঝামেলা এড়াতেই বোধহয় সে বেচারি কামড়ে দিল খোদ গেরস্তকেই। দ্বিতীয়টি অবশ্যি অহিংস ধর্মের পরিচয় দিয়েছিল। ডুয়ার্সে এখন বর্ষার দাপাদাপি। এই সময় স্থানীয় সাপদের একটু ‘নাগরিক’ হওয়ার ইচ্ছে জাগে। দেখিস বাপু! কোথাও সাপ দেখলে দড়ি ভেবে ইগনোর করিসনে। ডুয়ার্স বড়ই সাপগ্রস্ত!

হে হেলমেট

এবার যতই গরম লাগুক আর গাঁইগুঁই করুন না কেন, সেসব আর কিচ্ছু ধোপে টিকবে না। হেলমেট ছাড়া বাইক চালাবেন তো কেলাবেন তিনি কেলাবেন। স্রেফ দু’বার হেলমেট ছাড়া আপনি ধরা পড়লেই আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা ফস করে বাতিল করে দেওয়ার আল্টিমেটাম দিয়ে দিয়েছেন জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপার। তা ভাল। বাইক আরোহীর জীবনের স্বার্থে হেলমেট তো জরুরি। কাগজেও এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি চলছে। হেলমেট না-পরা পুলিশের ছবি ছাপা হওয়ার পর সে পুলিশ ‘সরি’ও বলেছে। লোকে হেলমেট বিনা তেল পাচ্ছে না। শিরস্ত্রাণের বিক্রিও দেদার বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু মন্দ লোকেরা বড় মন্দ। সে দিন এমনই এক মন্দ লোক বলছিল, সাংবাদিকদের অনেককেই তো হেলমেট পরতে দেখছিনে। ইহা কি ঠিক? কবি না বলিয়াছিলেন, ‘আপনি আচরি ধর্ম লিখো হে রিপোর্ট’!

‘বাঁশ’ হচ্ছে না বাস

‘এখানে বাস থামিবে’ কথাটা লেখা ছিল বটে, কিন্তু লেখার পর বাস-টাস কস্মিনকালেও দাঁড়ায়নি। যার জন্য নাগরাকাটা অধিবাসী ব্যবসায়ীরা বিপাকে পড়ে গিয়েছিলেন। সড়কনির্ভর যোগাযোগে বাস না থামাটা একটা ‘বাঁশ’ হচ্ছিল দিন দিন। তবে আন্দোলন করলে কী না হয়। ভারত স্বাধীন

হয়ে গেল, দেশভাগ হয়ে গেল, আর সামান্য বাস থামবে না? তাই এবার খোদ নাগরাকাটার ব্যবসায়ী সমিতি উদ্যোগ নিয়েছিল! বাসের চালকরা বাধ্য ছেলের মতো থামিয়ে দিচ্ছে গাড়ি। এদ্দিন বাস স্ট্যান্ডের সম্মানহানি ঘটছিল। এবার সেই হারানো সম্মান নাগরাকাটা বাস স্ট্যান্ড ফিরে পেল এক দশক পর।

ছাগলামি

নারীর কারণেই নাকি ইতিহাসে বড় বড় যুদ্ধ। সে ট্রয়ের যুদ্ধই হোক আর রাম-রাবণেই। তবে ইদানীং মানুষের মনে সংকীর্ণতা এসেছে, তাই যুদ্ধের পিছনে এখন ছাগলের মতো ‘চতুষ্পদ নারী’। স্থান ধূপগুড়ি। পাত্র দুই যুযুধান পরিবার। যুদ্ধের কারণ সংক্ষেপে এইরকম— একটি পরিবারের পালিত ছাগল প্রতিবেশী পরিবারের ধানখেতে ‘ধান খেতে’ চলে আসে। এই অনুপ্রবেশে রাগে টং হয়ে সেই পরিবারের বীরপুরুষ ছেলে ছাগলের পায়ে মেরে দিয়েছেন কাস্তের এক কোপ। ব্যাস! তারপর ‘মার মার’ ধুন্ধুমার। অনেক কষ্টে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু চারপেয়ে নারী দিয়ে দোপেয়ে পুরুষদের এই যুদ্ধের খবর শুনে ছাগলরা মর্মাহত। ‘ওদেরও কি আমাদের মতোই বুদ্ধি?’ ব্যা ব্যা রবে এই প্রশ্নই তুলছে তারা। কিন্তু বুঝছে কেডা?

স্কন্দকাটা

এসব কী শুরু হয়েছে বলুন তো মশাই? মামদোবাজি! এতদিন তাও হাতি শিকারের গল্পে যা পড়েছি তা নেহাত মানা গেল। কিন্তু এসব কী? হাতি বলে কি মানুষ নয়? স্কন্দকাটা হাতি দেখেছেন কখনও? সেইরকম নৃশংস কাণ্ড ঘটে গিয়েছে গো। মুণ্ডুকাটা হাতির দেহটা রায়ডাক নদীর ধারে পাওয়ার পর থেকে তুমুল উত্তেজনা আলিপুরদুয়ারে। মন্ত্রী বিনয় অবশ্যি জানিয়ে দিয়েছেন যে, এরকম নজির ডুয়ার্সে আগে ঘটেনি! এ নির্ঘাত ভুটানের কম্ম। ওরাই এক ধরনের

উটকো সংস্কারে বিশ্বাসী। কিন্তু বিনয়বাবু ‘হাতিদের জন্মনিয়ন্ত্রণ’ করার প্রস্তাব দিয়ে সবাইকে ঘাবড়ে দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে। তাই স্কন্দকাটা হাতির ব্যাখ্যায় জনগণের সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

এঁচোড়ে পক্ক

বাপ রে কী রসবোধ! এহেন এঁচোড়ে পাকা ছেলেও হয়? তাও আবার হাতের নাগালেই! কোচবিহারে! বয়স শুনলে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। ১৩!! অথচ সে নাকি বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে পারে কোচবিহার রাজবাড়ি। এমন হুমকি তাও যাকে-তাকে নয়, খোদ কোতোয়ালি ‘১০০’ নম্বরে। তারপর তো ছোটাছুটি-তল্লাশি-উত্তেজনা-টেনশন ইত্যাদি পেরিয়ে ছেলে গ্রেপ্তার। সম্ভাব্য জঙ্গির বয়স আর চেহারা দেখে পুলিশ কয়েক সেকেন্ড বাক্‌রুদ্ধ। তারপর জেরা। জানা গেল, ‘প্র্যাকটিক্যাল জোক’ করতে চেয়েছিল সে। তা বাপু তেমন ‘জোক’ করবি তো ইয়ারদোস্তদের সঙ্গে কর। বোমা-বন্দুক নিয়ে ‘জোক’ করিসনে বাছা। ডাকাত তো কচু গাছ কাটতে কাটতেই হয় রে।

ছিদ্রান্বেষণ

শিক্ষকহীনভাবে আপাতত কাজকর্ম চলছে জলপাইগুড়ি জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজে। আপনি যতবারই যাবেন, সেই এক

মুখশ্রী দর্শন। একটাই টিচার, যিনি প্রতিবারই বলেন, এইবার সরকার শিক্ষক নিয়োগ করেছেন, এইবার শিক্ষকের দল হুড়মুড়িয়ে ঢুকবে। কিন্তু বিধি বাম। আপনাকে বারবার হয়রানি করিয়ে ছাড়বে এই ব্রিটিশ আমলের শিক্ষাক্ষেত্রটি। কুজনরা অবশ্যি মিচকে হাসি দিয়ে জানাচ্ছেন, ‘শিক্ষকদের শেখাতে আবার শিক্ষক লাগবে কেন?’ আর সেই কলেজের হস্টেলের ঘরে ঘরে যে সাপের বাসা, তার কী হবে? কেন রে বাবা! দিনবাজার তো কাছেই। কার্বলিক অ্যাসিড কিনে আনলেই তো ঝামেলা শেষ! শুধু দোষ ধরা, তা-ই না?

বাঘামদানি

বাঘ চাই বাঘ। আমাদের ডুয়ার্সে শুনলাম একটাও বাঘ নেই। সব শেষ। গত দেড় দশকে বাঘের মুখশ্রী দর্শনের সৌভাগ্য না ঘটার ফলে এবার উঠে-পড়ে লাগা হয়েছে। আসামের আসামি বাঘেরা কিছুদিনের মধ্যেই সশরীরে হাজির হচ্ছেন বক্সার ব্যাঘ্র প্রকল্পে। সত্যিই কি এখন ডুয়ার্সে বাঘ নেই? আরে বাপ, বাঘ বলতে চিতা বুঝাইনি কিন্তু! এ একেবারে আসল সাইজের ‘বাঘ’ বাঘ হে। এরা নাকি ডুয়ার্সে নেই। তাই আসামের কাজিরাঙার সঙ্গে ‘ব্যাঘ্র বন্দোবস্ত’ হয়েছে। তা আমাদের ‘সোঁদরবন’ থেকে কয়েকটা রয়্যাল বাঘা আনা যেত না?

জয় বাবা জল্পেশ্বর

শ্রাবণ মাস মানেই ডুয়ার্সের বৃহত্তম পার্বণ ‘জল্পেশ মেলা’। শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য অফুরন্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা আর বিচিত্র কল্পনাশক্তির প্রকাশ। তা শুরুটা মন্দ হয়নি। তিস্তায় জল থাকায় গতবারের মতো ফ্যাসাদে পড়তে হয়নি পুণ্যার্থীদের। জল্পেশ মেলাকে কি ‘মেলাশ্রী’ শিরোপা দেওয়া হয়েছে? এই ভাবনার কারণ হল, এই যে সে দিন এক আধা রাজনৈতিক মঞ্চে বলতে গিয়ে জনৈক বক্তা উৎসাহ নিয়ে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, বঙ্গশ্রী ইত্যাদি উল্লেখের পর পষ্ট বললেন, ‘এই যে মেলাশ্রী শুরু হল জল্পেশে...’। কোথায়? না বাপু, অত ইনফো দিতে পারবুনি।

ডুয়ার্সস্য গুজবং

সে দিন যা শুনলাম, তাতে তো চক্ষু কপালে! সুবেদার বুদ্ধদেব আর পারিষদ সুগন্ধবাবু নাকি পরস্পরের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছেন! আরেক পারিষদ সূর্যদেবের মতিগতির আন্দাজ পাচ্ছেন না বলেই নাকি ‘মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং’-এ কিছু প্রকাশ করছেন না। কিন্তু এর প্রভাব যে ডুয়ার্সের দু’টি সুবায় টুপটুপ করে পড়বে, সেটা কি ঢাকা থাকছে গো? কোথায় পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে জেতার পর মন্ত্রী, সুবেদার, পারিষদ, অনুগত সেনানী— সবাই চন্দ্রহাসি মুখ করে ঘুরে বেড়াবে তা না, দেখে যেন মনে হচ্ছে, ‘কী আশায় বাঁধি খেলাঘর বেদনার বালুচরে’। এই তো সে দিন রাজ্যেশ্বরীর দরবার বসেছিল ডুয়ার্সে। সেখানে মুখ দেখে কি বোঝার জো ছিল? কিন্তু রাজ্যেশ্বরী যেন ঠিকই করে রেখেছেন যে, ‘শিলসুবা’র তুলনায় ‘কোচসুবা’কেই প্রাধান্য দেবেন। নইলে গোঁসাইকে ডেকে উত্তরের রথ পরিবহণের দায়িত্ব দেওয়ার কী মানে? এমনিতেই ডুয়ার্সে ‘কমল দল’ বাড়ছে। বিরুদ্ধে ‘জাতীয় পাঞ্জা’ আর ‘রক্ত তারকা’র বন্ধন ঢিলে হওয়ার লক্ষণ নেই। সামনেই ‘গ্রামকর্তা’ বাছাই অনুষ্ঠান। সর্বোপরি রাজ্যেশ্বরী। তাঁর বক্রদৃষ্টির ভয়েই নাকি আপাতত শান্তিকল্যাণ।

হাতিস্কুল

বক্সার গভীর অরণ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করে হাতিদের ক্লাস নেওয়া হবে। পরিকল্পনা পাকা। হাতিদের সহবত শেখানোর জন্য এই উদ্যোগ। মানুষের খেত, ঘরবাড়ি, প্রাইমারি স্কুল, মায় সরকারি আপিসে হানা দিয়ে

‘আজ ক্লাস বাংক করব’

চাল-ডাল-হাঁড়িয়া-লবণ নিয়ে আসাটা যে ফৌজদারি অপরাধ তা বোঝানো হবে হাতিদের। তিন মাস কি ছ’মাসের মাথায় ‘টেস্ট’। মাধ্যমিক কদ্দিনে জানা যায়নি। মিডডে মিল কী হবে, সেটাও অজ্ঞাত। হাতিরা নিজেদের মিডডে মিলের চাল নিজেরাই চুরি করবে কি না, বলা যাচ্ছে না। কারণ এই কর্মটি মানুষরা করে। আশঙ্কা, হাতিরা এটা চটপট শিখে নেবে। তবে হাতিদের ‘গার্জিয়ান কল’ করা যাবে না।

টুক্রাণু

বাঁদরামি সহ্য করলেন মিলন পাড়াবাসী, কিন্তু সেটা বাঁদরের হওয়ায় খুব একটা রাগ করেননি। ডুয়ার্সের যে কোনও প্রান্তে মোটরচালিত বাইকের ইঞ্জিন লাগানো ‘ভ্যানো’ গাড়ির আবদার বেড়েই চলেছে। আবার তক্ষক পাচার এবং গ্রেপ্তার এবং আবারও হবে। চালসায় ঐতিহাসিক ট্রাফিক জ্যাম একটি হাতির কারণে। জলপাইগুড়িতে ‘অজানা জ্বর’-এর রহস্য এখনও ভেদ হয়নি। শোনা গেল, চুপিচুপি ডুয়ার্সের সচল চা-বাগান পরিদর্শন করে গেলেন ডানকানস কর্ণধার, যা খুবই রহস্যজনক কাণ্ড বলে অনুমান জনতার। গোটা ডুয়ার্সে লাখ বিশেক নাগরিকের র‍্যাশন কার্ড খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ বছর ‘পুরসভা’র তকমা জুটবে কি না তা নিয়ে বাজি লাগানো হচ্ছে ময়নাগুড়িতে।

নকশালবাড়ির পঞ্চাশ বছর

একবার ফিরে দেখা

৩১ নং জাতীয় সড়ক ধরে যখন শিলিগুড়ি থেকে নকশালবাড়ির উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম, তখন আকাশটা থমথমে। অসহ্য গুমট গরম। সবুজ চা-বাগান, চা-পাতি তোলার কাজে লিপ্ত শ্রমিকদলের যূথবদ্ধ প্রয়াস, হিমালয় পাহাড়কে চুম্বনে উদ্যত ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘের সমারোহ, বিশ্বায়নের সুবাদে সার্ক করিডরের রাস্তা প্রসারের আন্তর্জাতিকমানের বিধিব্যবস্থা দেখতে দেখতে পথ পেরিয়ে যাচ্ছি। হিমালয়ের কোলে যেখানে মেঘেরা ঘনীভূত হচ্ছে, তারই কোল ঘেঁষে প্রত্যন্ত গঞ্জ নকশালবাড়িতে যাচ্ছি। নকশালবাড়ির বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের ঐতিহাসিক পঞ্চাশ বছর পূর্তির আলোকে বর্তমান নকশালবাড়ি কেমন আছে, তারই সুলুকসন্ধান করতে এই সুহানা সফর। তরাইয়ের সুবিখ্যাত চায়ের আঘ্রাণ মনে করিয়ে দেয় চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, মহাদেব মুখার্জি, সরোজ দত্তদের। পাতা তুলছে শ্রমিকরা, স্থানীয় কারখানায় চা-পাতি বিদেশে পাড়ি দেবার আগে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু এই চা-পাতির সুঘ্রাণের পিছনেই রয়েছে আন্তর্জাতিক দুনিয়া কাঁপানো সেই শ্রেণিসংগ্রাম, যা কাঁপিয়ে দিয়েছিল সে দিনের সেই গঞ্জ নকশালবাড়িকে।

নকশালবাড়ি এসেছি ১৯৬৬-৬৭-র সেই উত্তাল ঝোড়ো দিনগুলির উত্তরাধিকারীদের খোঁজে, যে ঝোড়ো দিনগুলিতে স্বাধীনোত্তর আধুনিক ভারতের কিষান আন্দোলন ছয়ের দশকের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নকশালবাড়িতে কেউ এলে আপাতদৃষ্টিতে বুঝতে পারবে না, এই সেই ছোট্ট গঞ্জ, যেখানে নকশাল এবং নকশালবাদী— এই দু'টি শব্দ শুধু সেই সময়কালের ইতিহাস হয়ে যায়নি। শিকড়বাকড় ছড়িয়ে তা আরও পল্লবিত হয়েছে। কলকাতাকেন্দ্রিক মাড়োয়ারি বেনিয়াদের দখলে এখন নকশালবাড়ি অঞ্চলের চা-বাগিচাগুলির অধিকাংশই মাড়োয়ারি বেনিয়ারা একদিন চটশিল্পকে যেভাবে ধ্বংস করেছিল, সেভাবেই চা শিল্পকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। একটি পেনিও খরচ করার পরিবর্তে তারা লুটেপুটে খাচ্ছে প্রতিটি পয়সা। এস্টেটগুলিতে একরের পর একর জমিতে ৯০ বছরেরও পুরনো চা গাছ। নতুন করে গাছ লাগানো হচ্ছে না। শ্রমিকদের অধিকার কাগজ-কলমেই সীমাবদ্ধ। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কোথায় যে যায়, তার হিসেব কেউই প্রায় রাখে না। গ্র্যাচুইটি না দেবার অজুহাতে পাঁচ বছর চা-বাগিচায় চাকরি হবার আগেই শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করে দেওয়া হয় নানা ছুতোনাতায় অথবা কারখানা ক্লোজার করে দেওয়া হয়। সেই চা-বাগিচা অধ্যুষিত প্রান্তর পেরিয়ে যখন নকশালবাড়ি প্রবেশ করলাম, তখন কোনও মাওবাদী বিপ্লবীর স্ট্যাচু আমাকে অভিনন্দন জানাল না। লায়ন'স ক্লাবের একটি সাইনবোর্ডে 'ওয়েলকাম টু নকশালবাড়ি' এবং কার্গিলের শহিদ সুরেশ ছেত্রীর স্ট্যাচু শহরের প্রবেশের মুখে। নকশালবাড়িতে ১৯৬৭-র ২৫ মে কোনও ঘটনা অবশ্য ঘটেনি। পানিট্যাঙ্ক বর্ডার থেকে কিছুটা দূরে একটি ছোট গ্রাম প্রসাদু জোতে সংঘর্ষ এবং পুলিশ ফায়ারিং ঘটে।

নকশালবাড়ি থেকে প্রসাদু জোত যাওয়ার পথে মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট গ্রুপের একটিও পতাকা বা অফিস চোখে পড়ল না। সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস বা বিজেপি'র ফ্ল্যাগ ঝুলছে, কিন্তু আগুন ঝরানো নকশালবাড়িতে নকশালপন্থী মাওদের অস্তিত্ব চোখে পড়ল না। 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস' বা 'চিনের চেয়ারম্যানই আমাদের চেয়ারম্যান' লেখা কোথায়? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল, সবকিছুই বদলে গেছে।

বেঙ্গুই জোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা শহিদ পিঠে ছবি তোলার জন্য আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। প্রাথমিক বিদ্যালয়টি থেকে ফুট দশেক দূরেই সরোজ দত্ত, মাও, লেনিন প্রমুখর আবক্ষ স্মারক এখনও সেই সময়কালের উজ্জ্বল স্মৃতি বহন করে চলেছে। আমার অনুরোধে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাদেব পাল চারু মজুমদার কে ছিলেন ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞেস করায় এ ওর মুখের দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। কানু সান্যাল, মাও, স্ট্যালিন সম্পর্কেও ওরা জানে না। এখনকার প্রজন্মকে এসব জানানোর প্রয়োজনও হয়ত কেউ মনে করেন না। স্ট্যাচুর পাশেই এগারোজন শহিদের স্মরণে স্মারক, যার মধ্যে ছ'জন স্ত্রীলোক এবং দু'জন শিশুও আছে।

নকশালবাড়ি বাজারে পেলাম নাথুরাম বিশ্বাসকে। আসবাবপত্র, প্লাস্টিকের চেয়ার, আলমারির বড়সড় দোকান। ছোটখাটো চেহারার সেই সময়কার সক্রিয় নকশাল নেতা নাথুবাবুকে দেখলে একেবারেই আদ্যন্ত একজন ঝানু ব্যবসায়ী বলেই মনে হবে। '৭০ দশকের হাতে গোনা কয়েকজন জীবিত এবং সক্ষম নকশালপন্থী নেতার মধ্যে নাথুরাম বিশ্বাস একজন। সাম্প্রতিককালে যদিও এই সংশোধনবাদী নকশাল নেতা একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী, তবুও সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের তিনি একজন সক্রিয় সদস্য, যিনি নিয়মিত এখনও সাংগঠনিক মিছিলে যান বা কৃষকদের স্বার্থরক্ষার দাবিতে আন্দোলন সংগ্রাম করেন। সরাসরি প্রশ্নগুলো সুকৌশলে তিনি এড়িয়ে যাচ্ছিলেন, কথা বলায়ও খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন না। ১৯৬৮ সালে কলেজ ছেড়ে দিয়ে চারু মজুমদারের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন তিনি। চারু মজুমদার একটি চিঠিতে কলেজ ছাত্রদের একটি গ্রীষ্মাবকাশ গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে কাটাতে বলেছিলেন। সেই লেখা পাঠ করে উদ্দীপ্ত হন তিনি। তথাকথিত 'বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা' না-পসন্দ ছিল বলে কলেজ ছাড়াটা তাঁর কাছে কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্বের ব্যাপার ছিল না বলেই মনে করেন এই নকশাল নেতা। এই ব্যাপারে তিনি তাঁর বিশ্বাসের জায়গায় আজও অটল। 'আমি গ্রামে এলাম, কৃষকদের অবস্থা সরাসরি প্রত্যক্ষ করলাম এবং তাদের স্বার্থে গণবিপ্লবে শামিল হলাম।' সাত বছর নেপালে কাটিয়েছিলেন, কিছুদিন বাংলাদেশে। আন্ডারগ্রাউন্ডে অবস্থান করে তিনি প্রিন্টিং প্রেস চালাতেন। হ্যান্ডবিল, প্যামপ্লেট, পোস্টার, বিপ্লবাত্মক পুস্তক প্রকাশ করতেন। কানু সান্যালের মুক্তির পর তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে আর যাননি, কারণ পার্টির ভাঙনের ফলে তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছে, হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন এবং পার্টি লাইনের ভুল ব্যাখ্যাকে বুঝতে পেরেছেন। যদি পুনরায় শুরু হয়, আবার যোগদান করবেন কি না— এই প্রশ্নের জবাবে যদিও তিনি জানালেন, 'কেন নয়? আমরা আমাদের জন্য আত্মোৎসর্গ করিনি, করেছি দরিদ্র কৃষকদের জন্য।' তথাপি আমার মনে হয়, সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নে বর্তমানে নাথুরাম বিশ্বাসের যোগদান করা কষ্টকল্পনা। সময়ই অবশ্য সব কিছু বলবে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত নকশালবাড়ি বাজারে ছেলের মোমোর দোকানের কাউন্টারে বসে থাকতেন মুজিবর রহমান। জীবনের সায়াহ্নবেলায় ১০৫ বছর বয়সেও তিনি বিশ্বাস করেন, বিপ্লব ব্যর্থ হয়নি। শোষিত শ্রেণির প্রতি এটা ছিল বার্তা। মতাদর্শগত বিরোধ,

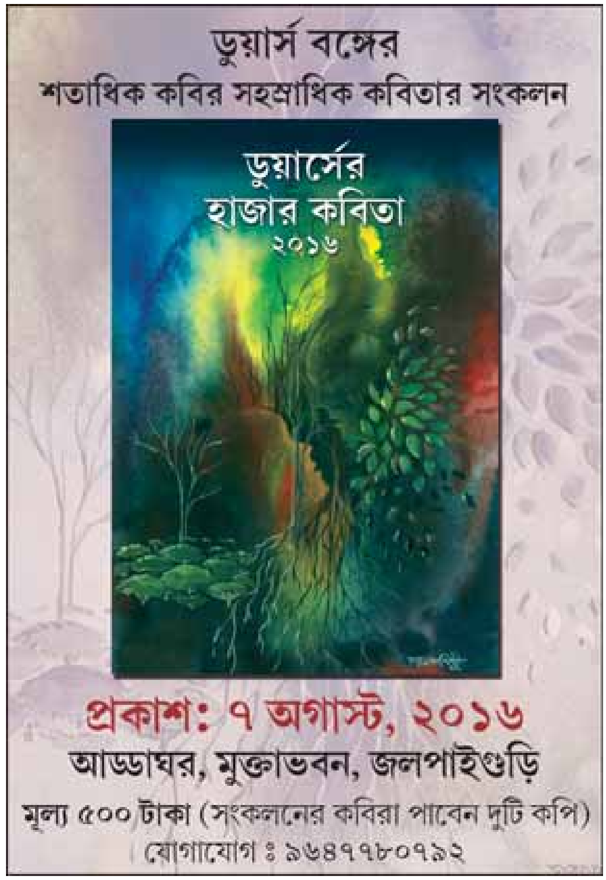

অন্তর্দলীয় কোন্দল এবং মত ও পথের ভুলেই আন্দোলন ব্যর্থ হয়। নকশালবাড়ির উত্তর কাতিয়া জোতের বাড়িতে বসে মুজিবর রহমান জানালেন, তাঁর বয়স ১০৫ বছর। আগুন ঝরানো দিনগুলির আবেগ এবং কারাগরের গরাদ তাঁর উদ্যমকে এখনও আটকে রাখতে পারেনি। বয়স তাঁর বিপ্লবী যৌবনশক্তিকে হার মানাতে পারেনি। এখনও যেন বিপ্লবের নামে শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠবে। 'জীবন্ত অথবা মৃত, আমার মাথার দর ধার্য হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। তবুও ভয়ডরহীনভাবে ঘুরে বেড়াতাম। কোনও পুলিশ বা সিআরপিএফ-এর আমাকে স্পর্শ করার ক্ষমতা ছিল না।' ১৯৪২ সালে ঢাকা জেল থেকে মুক্তি পাবার পর রহমান কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, 'সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জয়প্রকাশ নারায়ণ উভয়েই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন, তাঁরা জানতে চান তাঁদের কী পদ দেওয়া হবে, যেখানে কমিউনিস্ট পার্টিতে সব ক্ষেত্রেই সাম্য, সকলেই সমান, সেখানে পদের কোনও মূল্য কী? কিন্তু তাঁরা যোগদান করলেন না।' জয়প্রকাশ নারায়ণ সোশালিস্ট পার্টি এবং সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর র‍্যাডিক্যাল সোশালিস্ট পার্টি খোলেন। মুজিবর রহমান স্বীকার করেন, প্রচুর শ্রেণিশত্রুকে খতম করা হয়েছে, কিন্তু বিপ্লব ঘটেনি। বার্ধক্যজনিত কারণে স্মৃতিভ্রষ্ট হননি এখনও। জরাগ্রস্ত শরীর এখনও টানটান। চোখে জ্যোতির দীপ্তি।

'৭০-৭১-এর দশকে কলকাতাসহ তামাম পশ্চিমবঙ্গের শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে যুবক-যুবতীকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছিল কংগ্রেস পরিচালিত ভিজিল্যান্স স্কোয়াড নকশাল দমনের নামে। কংগ্রেসের যুব নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের মাস্টারস্ট্রোককে কাজে লাগিয়েছিলেন পুলিশ চিফ রণজিৎ গুহ, রুনু গুহনিয়োগীরা। ১৯৭১-এর অগাস্টে ঘটে কুখ্যাত কাশীপুর-বরানগর গণহত্যা। বাড়িতে বাড়িতে নকশাল খোঁজার নামে গণধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, যুবকদের প্রহার করে ত্রাস সঞ্চার করে প্রশাসন এবং কংগ্রেসের ক্যাডার বাহিনী। দশ হাজারেরও বেশি মাওবাদী এবং তাদের সমর্থনকারীদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। অধিকাংশ নেতাকে কারাগারে বন্দি করে অকথ্য অত্যাচার করা হয়। সরোজ দত্ত প্রমুখ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতালরা ছিলেন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের চোখে 'মোস্ট ওয়ান্টেড ম্যান'।

জঙ্গল সাঁওতালের জন্ম বা মৃত্যুর সঠিক তারিখ সংক্রান্ত কোনও স্মারক চোখে পড়ল না নকশালবাড়িতে। নকশালবাড়ি গণ-আন্দোলনের তিনি ছিলেন মূল চালিকাশক্তি। উপজাতি সাঁওতাল সমাজে জঙ্গল সম্মাননীয় একজন কৃষক নেতা। বিপ্লবী কৃষক সংগঠনের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রাদেশিক নেতৃত্ব, যাদের দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল জমিদার, জোতদার বা মধ্যস্বত্বভোগীদের থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে এসে ভূমিহীন কৃষকদের বণ্টন করা। সশস্ত্র বিপ্লবীদের সেই দলে তিনিও ছিলেন একেবারেই সামনের সারিতে, যারা পুলিশ অফিসার সোনম ওয়াংদিকে তির দিয়ে হত্যা করেছিল। দীর্ঘদিন ধরে আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা এই নেতাকে ঘিরে রচিত হয়েছিল মিথ। নকশালবাড়ির অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল সেই বীরগাথা, 'জেল কা তালা টুটেগা/ কানু, জঙ্গল ছুটেগা।'

এবার যেতে হবে প্রবাদপ্রতিম নকশাল নেতা কানু সান্যালের কমিউনে। এলাম হাতিঘিষা। দার্জিলিং জেলার এক কৃষিজীবী অধ্যুষিত ছোট্ট গ্রাম। অজ থেকে ষাট বছর আগে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হয়েছিল ছোট্ট এই প্রত্যন্ত গ্রামটি থেকে, যা উত্তরবঙ্গের মাটিকে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল নকশাল আন্দোলন রূপে। মত ও পথ যা-ই হোক না কেন, ভুল কি ঠিক, সেই প্রশ্নে তীব্র বিতর্ক থাক না কেন, এ কথা অস্বীকার করা যাবে না, কৃষকের অধিকার আদায়ের লড়াইতে তেভাগা-তেলেঙ্গানার লড়াইয়ের মতোই তীব্র গণ-আন্দোলনের অগ্নিসাক্ষী হয়েছিল উত্তরবঙ্গের একটি অখ্যাত, অজ্ঞাত জনপদ দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি। এই নকশালবাড়িরই হাতিঘিষা গ্রাম আজও জঙ্গল সাঁওতাল, চারু মজুমদার, কানু সান্যালদের নামে কপালে জোড়হাত করে। অবশ্যই প্রবীণরা। কারণ নবীনরা নকশাল আন্দোলনের ঝাঁজ প্রত্যক্ষ করেনি। বামপন্থী গণ-আন্দোলনের মর্মমূলে প্রবেশ না করে চাওয়া-পাওয়ার রাজনীতিই এখনকার যুবসমাজকে আন্দোলনবিমুখ করে তুলছে বলে মনে করেন সমাজকর্মীরা। তাই নকশাল আন্দোলনের ষাট বছরের সালতামামি আলোচনা করতে গেলে মোদ্দা যেটা দাঁড়ায়, সেটা হল যে, আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল ষাট

বছর আগে, সেটা কিন্তু সাম্প্রতিকালে ডালপালা মেলে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশাতেও পল্লবিত। ইতিহাসের প্রেক্ষিতেই তাই ষাট বছর আগের বজ্রনির্ঘোষকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

সাঁওতাল উপজাতিভুক্ত জঙ্গল সাঁওতাল নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের সংগ্রামী নেতৃত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন ১৯৬৭ সালে। দার্জিলিং জেলার সাঁওতাল জনজাতির মানুষরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করত। ১৯৬৭ সালের কৃষক আন্দোলনে তিনি কিষান ইউনিয়নের বরিষ্ঠ নেতৃত্ব হিসেবে বামপন্থী আন্দোলনের দিশা নির্দেশের কাজে যুক্ত ছিলেন। ভূমিহীন চাষিদের জমি বণ্টনের দাবিতে তখন উত্তাল কৃষক আন্দোলন। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতিও চলছে। বামপন্থী শিবির তখন মত ও পথের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে চিন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পরবর্তীকালে চিনের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব, অন্য দিকে, কৃষক আন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রামের প্রশ্নে কমিউনিস্ট আন্দোলনকারীদের মতাদর্শগত সংকট— এই প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ভাঙন যখন অনিবার্য, তখন সেই প্রেক্ষাপটেই জোতদারদের লেঠেলবাহিনীর হাতে আক্রান্ত ভূমিহীন খেতমজুরদের পাশে দাঁড়ালেন জঙ্গল সাঁওতাল। ইন্সপেক্টর সোনম ওয়াংদির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী কৃষক নেতৃত্বসহ ভূমিহীন খেতমজুরদের গ্রেপ্তার করতে এলে জঙ্গল সাঁওতালের নেতৃত্বে তির-ধনুক নিয়ে শুরু হয় সশস্ত্র আন্দোলন। সাঁওতালদের তির এ ফোঁড়-ও ফোঁড় করে দেয় সোনম ওয়াংদিকে। মৃত্যু হয় তার। আর এই সশস্ত্র সংগ্রামই পথ দেখায় সশস্ত্র পথে ভূমিহীন কৃষকদের অধিকার রক্ষার লড়াইকে। শুরু হয় নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে নকশাল আন্দোলন। গ্রেপ্তার হন জঙ্গল সাঁওতাল। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর, বন্দিমুক্তি আন্দোলনের ফলে জেল থেকে ছাড়া পান প্রবাদপ্রতিম নকশাল নেতা জঙ্গল সাঁওতাল। কিন্তু পুরনো সঙ্গীসাথিদের পাশে না পেয়ে এবং প্রিয়জনরা মুখ ফিরিয়ে নেওয়াতে হতাশাগ্রস্ত হয়ে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাতে শুরু করেন, এবং ১৯৮৭ সালে অবিসংবাদিত এই নেতা প্রয়াত হন।

প্রকৃতপক্ষে নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্যতম নেতা চারু মজুমদার চিনের চেয়ারম্যান মাও জে দং-এর মতাদর্শকে সমর্থন করতেন। ভারতীয় কৃষক, জনজাতি সম্প্রদায় এবং নিম্নবর্গের ও নিম্নবর্ণের মানুষের চিনের মতো ওই পথকে অনুসরণ করে উচ্চবর্ণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারকে এবং তথাকথিত উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণকে শ্রেণিশত্রু বলে চিহ্নিত করা আশু কর্তব্য বলেও মনে করতেন। তিনি মনে করতেন, উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণ এবং তাদের দ্বারা নির্বাচিত বুর্জোয়া সরকার কৃষকস্বার্থ বিরোধী। তিনি তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক আটটি আদর্শ বা পন্থা নকশাল আন্দোলনের মতাদর্শ হিসেবে প্রকাশ করেন। চিনের কমিউনিস্ট পার্টি মে মাসে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনকে 'বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ' (দ্য স্প্রিং থান্ডার অব ইন্ডিয়া) আখ্যায় ভূষিত করে। সাধারণভাবে মনে করা হয়, নব মতাদর্শের এই বামপন্থী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা করায়ত্ত করা। কিন্তু কৌশলগত দিকটি ছিল, দেশব্যাপী প্রচলিত পুরনো সামন্ততান্ত্রিক বিধিব্যবস্থাকে ছিন্ন করে অত্যাচারী জমিদার এবং জোতদারদের হাত থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে জমি ছিনিয়ে নিয়ে এসে ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে তা বণ্টন করে দেওয়া। এই লক্ষ্যে গেরিলা সংগ্রামের মাধ্যমে কৃষকদের ছোট ছোট সশস্ত্র দল তৈরি করে জমিদার এবং তাদের রক্ষাকারী হিসেবে পুলিশ প্রশাসনকে চিহ্নিত করা হয়। তাই ১৯৬৭-র ২৪ মে নকশালবাড়ির কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে ঢেউ ওঠে তা প্লাবিত করে বঙ্গীয় জনমানসকে। অগ্নিগোলকের মতোই তা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। শহুরে শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত যুবক-যুবতীরা প্রভাবিত হয় এই আন্দোলনে। তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোক তথা বাবু সম্প্রদায় স্বল্প সময়ে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনে আবেগের স্পন্দন খুঁজে পায়, এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আন্দোলনকে সমর্থন করে।

জঙ্গল সাঁওতালের জন্ম বা মৃত্যুর সঠিক তারিখ সংক্রান্ত কোনও স্মারক চোখে পড়ল না নকশালবাড়িতে। নকশালবাড়ি গণ-আন্দোলনের তিনি ছিলেন মূল চালিকাশক্তি। উপজাতি সাঁওতাল সমাজে জঙ্গল সম্মাননীয় একজন কৃষক নেতা। সশস্ত্র বিপ্লবীদের সেই দলে তিনিও ছিলেন একেবারেই সামনের সারিতে, যারা পুলিশ অফিসার সোনম ওয়াংদিকে তির দিয়ে হত্যা করেছিল। দীর্ঘদিন ধরে আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা এই নেতাকে ঘিরে রচিত হয়েছিল মিথ।

কিন্তু নকশালবাড়ি আন্দোলনের ষাট বছর পরে ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে উঠে আসে অনেক অজানা তথ্য। সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিকায় তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ না করলে নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ঠিক হবে না বলে মনে করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভাগের আধিকারিক অজয় মিশ্র।

অর্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর স্তর অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে গবেষণাধর্মী কাজ করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেছেন কিছু অজানা তথ্য। তাঁর মতে, নকশালবাড়ি আন্দোলনের ভিত খুঁজতে গেলে প্রথমেই দেখা দরকার এলাকার জনবিন্যাসের চরিত্র। যে সমস্ত কৃষক শ্রেণিসংগ্রামে লিপ্ত ছিল, তাদের অধিকাংশই রাজবংশী। প্রশ্ন ওঠে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ছিল যে রাজবংশী ভূমিহীন কৃষকরা, নকশালবাড়ি আন্দোলনে সেই রাজবংশী সম্প্রদায়ের কৃষক নেতা নেই কেন? থাকলে তাঁরা কারা? দ্বিতীয় প্রশ্ন, যে সমস্ত কৃষক আধিয়ার এবং জোতদারদের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল, তাদের সামাজিক বিন্যাসে তারা রাজবংশী। কিন্তু জোতদার বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত এবং সরাসরিভাবে জড়িত নেতা জঙ্গল সাঁওতাল একজন উপজাতীয় সাঁওতাল। পুলিশবাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জড়িত বিপ্লবীরাও সাঁওতাল এবং চা-বাগিচা শ্রমিক, যারা তির-ধনুক সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। কাজেই কাদের শ্রেণিস্বার্থে আঘাত হেনেছিল জোতদাররা? রাজবংশী ভূমিহীন কৃষক না চা-বাগিচা শ্রমিক, সেটাও একটা প্রশ্ন। নকশালবাড়ির ভৌগোলিক জনবিন্যাস অনুযায়ী চা-বাগিচা রোপণ হবার পরে তরাইয়ের এই বিস্তীর্ণ চা-বাগিচা ক্ষেত্রে ছোটনাগপুর থেকে আসা একদল শ্রমজীবী মানুষই চা-বাগিচা শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করে। বেশির ভাগ বাগিচা শ্রমিক চা-বাগিচার উদ্‌বৃত্ত জমিতে চাষাবাদ শুরু করে অথবা চা-বাগিচার পার্শ্ববর্তী পতিত জমিকে চাষাবাদের উপযুক্ত করে চাষের কাজ শুরু করে। এই সকল জোতজমির বেশির ভাগই ছিল স্থানীয় রাজবংশী জোতদারদের দখলে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক তাপসরঞ্জন মজুমদারের মতে, নকশালবাড়ি আন্দোলনের সময় নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া এবং খড়িবাড়ি থানা এলাকায় ৩২টি চা-বাগিচা শ্রমিক ছিল মোট স্থায়ী বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩০ শতাংশ। ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জঙ্গিয়ানাকে আরও ত্বরান্বিত করতেই চা-বাগিচা শ্রমিককে আরও সংগঠিত করার প্রয়োজন ছিল। বাগিচা শ্রমিকদের অবিসংবাদিত বামপন্থী নেতা চারু মজুমদার এবং কানু সান্যালরা সেই সুযোগ গ্রহণ করেন।

বহিরাগত ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে আসা উপজাতি সম্প্রদায় কমিউনিস্ট অধ্যুষিত চা-বাগিচা শ্রমিক সংঘের সদস্য হিসেবে অথবা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে নকশালবাড়ি অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। চিরাচরিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বা ভূমিব্যবস্থার কোনও কাঠামোগত পরিবর্তন না চেয়ে কৃষকসভা ভূমিহীন কৃষকরা যাতে শস্যের পর্যাপ্ত ভাগ পায়, সেদিকে দৃষ্টি রেখেই আন্দোলন শুরু করে। আবেদন-নিবেদন নয়, বলপূর্বক জবরদখল ছিল মূল ভিত্তি। গবেষকদের মতে, তথাকথিত কৃষক যারা সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, তারা ছিল উপজাতিভুক্ত বহিরাগত শ্রমিকদের শ্রেণিশত্রু। আন্দোলনের পিছনে কোন কৃষক নেতা ছিলেন তা খোঁজার বিস্তর প্রচেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ফল মেলেনি। কোনও কৃষক নেতার খোঁজ পাওয়া যায়নি।

জঙ্গল সাঁওতাল, চারু মজুমদার, কানু সান্যালরা ছিলেন বহিরাগত বা অভিবাসী। চারু মজুমদার এক প্রভাবশালী বাঙালি কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসে শিলিগুড়ি শহর সন্নিকটস্থ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। কানু সান্যাল ছিলেন একজন উচ্চবর্ণের বাঙালি উদ্‌বাস্তু। জঙ্গল সাঁওতাল ছিলেন একজন অভিবাসী সাঁওতাল জনজাতির নেতা। সকলেই ছিলেন চা-বাগিচার শ্রমিক নেতা, কেউই কৃষক নেতা ছিলেন না এবং কৃষি, কৃষক বা কৃষি আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি কোনও সম্পর্ক কারও ছিল না। বাঙালি মধ্যবিত্ত বাবু সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু নেতাও এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের উদ্‌বাস্তু। এটা অস্বীকার করা যায় না, রাজবংশী আধিয়ার এবং জোতদারদের একটা অংশ কৃষক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়েছিল। সঠিকভাবে নয়। আন্দোলনের যে সকল রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ এগিয়ে আসেন, তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন বাংলাদেশি উদ্‌বাস্তু। আন্দোলনে অনেক রাজবংশী আধিয়ার রাজবংশী জোতদারদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। রাজবংশী এবং উপজাতিদের যে সুসম্পর্ক ছিল না, তার প্রমাণ প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা জঙ্গল সাঁওতাল ১৯৬৭-র নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে হেরে যান সম্প্রদায়গত বিভাজন সৃষ্টি করে, যেখানে দেখা যায়, মধ্যস্বত্বভোগী কৃষকসমাজ অথবা ক্ষুদ্র জনজাতি সম্প্রদায়ের জোতদার যোগদান করে জমিদারদের পক্ষে। তাই নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কৃষক আন্দোলন না বলে এটিকে বহিরাগত জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত বিদ্রোহ বলা হয়।

ইতিহাসের অধ্যাপক সুজিত ঘোষের মতে, রাজবংশী জোতদার এবং রাজবংশী আধিয়াররা পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। বিবাহ এবং অন্যান্য ধর্মীয় পালপার্বণসহ বিভিন্ন সামাজিক কাজে একে অপরের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত। রাজবংশী জোতদার এবং জমিদাররা গ্রামের একই কুয়ো থেকে যখন জল খেত, তখন অভিবাসী উপজাতিরা জল-অচল ছিল। কাজেই নকশালবাড়ির আন্দোলনকে শ্রেণিসংগ্রাম অথবা কৃষক আন্দোলন বলে নকশালরা যতই আখ্যায়িত করার চেষ্টা করুক না কেন, শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব যুক্তিতেই খাটে না। তথাকথিত শ্রেণিশত্রুরা ছিল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজবংশী জোতদার ও জমিদার, যারা ছিল সমগ্র অঞ্চলের পতিত এবং আবাদি জমির স্বত্বাধিকারী। তাদের জমি দখল করছে

অভিবাসী আদিবাসী সাঁওতাল সমাজ আর তথাকথিত উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি কানুবাবু-চারুবাবুরা বলছেন, এটা শ্রেণিসংগ্রাম। এটা হাস্যকর যুক্তি। এমনকি সাঁওতালরাও পরবর্তীকালে নকশাল নেতাদের কল্পিত শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্বকে উপলব্ধি করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই নকশাল আন্দোলনে উপজাতি জনজাতিভুক্ত মানুষের ব্যাপক গণসমর্থন ছিল না। সাম্প্রতিককালে নকশালবাড়ি অঞ্চলে এই আন্দোলনের কোনও আদর্শভিত্তিক মতাদর্শগত লড়াই বা সংগ্রামের অস্তিত্ব নেই।

তবে প্রদীপের নিচে শুধুই কি অন্ধকার? শুধু ভারতে নয়, বিদেশেও সেই ধরনের ব্যতিক্রমী রাজনীতিবিদদের একজন ছিলেন কানু সান্যাল, যিনি সমগ্র জীবন আত্মোৎসর্গ করেছিলেন দরিদ্র এবং অত্যাচারিত মানুষের স্বার্থরক্ষায়। অকৃতদার এই মানুষটির ছিল অনাড়ম্বর জীবনযাপন। শোষিত আদিবাসী চা শ্রমিকদের সামাজিক-অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষায় তিনি ছিলেন আপসহীন। একটি সাদামাটা এক ঘরের মাটির কুঁড়েঘরেই ছিল তাঁর পার্টি অফিস তথা কমিউন। বাপ্পাদিত্য পালের লেখা 'দ্য ফার্স্ট নকশাল' বইতে তাঁকে গান্ধিজির সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন এমনই এক ব্যতিক্রমী চরিত্র, যাঁর জীবনটাই ছিল মহাজীবন। প্রবাদপ্রতিম নেতা কানু সান্যালের মতাদর্শের সাম্প্রতিক হাল দেখতে হাতিঘিষা গ্রামের মাটির পর্ণকুটিরে যখন প্রবেশ করলাম, তখন ভরদুপুর। রোদের তেজ প্রখর। কাঠের বেঞ্চ, ছোট লোহার একটি টুল। দরজায় ছোট একটা পিতলের ডালা। বিবর্ণ একটি লাল পতাকা কুঁড়েঘরের বাইরে ল্যাম্পপোস্টে বাঁধা। আমি ছোট্ট জানালা দিয়ে উঁকি মারলাম এবং দেখতে পেলাম ফ্রেমে আটকানো সাদা-কালো রঙের মার্কস, মাও, অ্যাঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিনের পোর্ট্রেট মাটির দেওয়ালে ঝুলছে। চাবি নিয়ে শান্তি মুন্ডা এসে দরজা খুলে দিল। এই সেই কুঁড়েঘর, যেখানে ২০১০ সালের ২৩ মার্চ কানু সান্যালের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। কাকতালীয়ভাবে এটাই ছিল সেই দিন, যে দিন ভারতীয় বিপ্লবী ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরুর ফাঁসি হয় ১৯৩১ সালে। ঘরের মধ্যে সম্পত্তি বলতে কিছু বই, কাপড়চোপড়, সামান্য বাসনপত্র। আর একটা পুরনো আমলের টাইপরাইটার মেশিন, যেটা ধুলোবালিতে অচল। এই প্রাচীন টাইপরাইটার মেশিনটির সাহায্যে কানু সান্যাল গরিব মানুষদের জন্য প্রচুর দরখাস্ত লিখেছেন। তাঁর এবং সহকর্মীদের কিছু ফ্রেমে বাঁধানো ছবি দূরবর্তী দেওয়ালে। এক কোনায় তাঁর ফাইল এবং বইগুলি জড়ো করে গোছানো। কিছু বাসনপত্র, বিছানাপত্র এবং কাগজপত্র ভাঁজ করা বিছানাতে জড়ো করে রাখা। বন্ধ হয়ে যাওয়া ঘড়ি জানান দিচ্ছে, বিকেল ৪টে বাজে। স্তূপীকৃত রাশি রাশি বইয়ের উপরের বইটির মুখবন্ধে লেখা— 'দ্য প্রোগ্রাম অব ইন্ডিয়ান রেভলিউশন অ্যান্ড ইট'স পাথ'। যে আলমারিতে তাঁর দুই প্রস্থ জামাকাপড় রাখা থাকত, আলমারির দরজা না খোলার ফলে তা আর দেখতে পারলাম না। শান্তি মুন্ডা মেঝেতে পড়ে থাকা প্ল্যাকার্ডটি তুলে বিছানাতে রেখে কানু সান্যালের পোস্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

৭২ বছরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রবাদপ্রতিম এই নকশাল নেতা মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতে অসুস্থ হয়ে এতটাই দুর্বল হয়ে যান যে, ঘরের বাইরে পদার্পণ করাও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। যদিও তিনি অসুস্থ ছিলেন, তবুও তিনি সরকারি হাসপাতালের সাহায্য গ্রহণ করেননি এই যুক্তিতে যে, আন্দোলন চলাকালীন তিনি রাজ্য সরকারের কাছে কোনও সাহায্য চাননি।

নকশালপন্থী রাজনীতিবিদদের মধ্যে কানু সান্যালই একমাত্র নেতৃত্ব, যিনি চেয়ারম্যান মাও দে জং-এর মুখোমুখি হয়েছিলেন। ১৯৬৯-১৯৭২-এ আন্ডারগ্রাউন্ড থাকাকালীন তিনি চিনে চান। কাঠমান্ডু পর্যন্ত একদল সঙ্গীর সঙ্গে আসার পর বেজিং পর্যন্ত জিপে করে চিনারা তাঁকে পৌঁছে দেয়। চিনে পৌঁছে ১ অক্টোবর জাতীয় দিবসে তাঁর সঙ্গে মাওয়ের সাক্ষাৎ হয়। 'দ্য পাথ অব রেভলিউশন'-এ কানু সান্যাল লিখেছেন, 'মাও-এর সঙ্গে আমার দেখা হল। ভারতীয় বামপন্থী কৃষক আন্দোলন নিয়েও কথা হল।' কানুবাবু স্বীকার করেছেন, নকশালবাড়ির পথ সঠিক ছিল না। মাত্র ১৫০টি রাইফেল নিয়ে কীভাবে চিনে বিপ্লব শুরু হয়েছিল এবং কীভাবে মাওয়ের বাহিনী চিনের মানুষের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল, মাও তাঁকে জানান। মাও জে দং কানু সান্যালকে মানুষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ গড়ে তুলতে পরামর্শ দেন। মাও তাঁকে পরামশ দেন, চিন সফরের অভিজ্ঞতা ভুলে গিয়ে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সঠিক সময়ের অপেক্ষায় থেকে আন্দোলন গড়ে তোলা।

ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, সেই সময় আর পঞ্চাশ বছর বাদে এই সময়। কৃষক অভ্যুত্থানের পঞ্চাশ বছর বাদে নকশালবাড়ি একই রকম রয়ে গিয়েছে। নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন কি সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে? হ্যাঁ, অভ্যুত্থান বৃথা যায়নি। পরবর্তীকালে ব্যাপক উন্নয়নের কর্মকাণ্ড ঘটেছে। ভূমিহীন কৃষকের নামে জমি হয়েছে। অনেকেই এখন জমির মালিক। চা-বাগিচাগুলিও সঠিক সময়ে শ্রমিকদের

তথাকথিত শ্রেণিশত্রুরা ছিল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজবংশী জোতদার ও জমিদার, যারা ছিল সমগ্র অঞ্চলের পতিত এবং আবাদি জমির স্বত্বাধিকারী। তাদের জমি দখল করছে অভিবাসী আদিবাসী সাঁওতাল সমাজ আর তথাকথিত উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি কানুবাবু-চারুবাবুরা বলছেন, এটা শ্রেণিসংগ্রাম। এটা হাস্যকর যুক্তি। এমনকি সাঁওতালরাও পরবর্তীকালে নকশাল নেতাদের কল্পিত শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্বকে উপলব্ধি করেছিল।

মজুরি দেয়। কৃষকরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। অনেক কমিউনিস্ট, যাঁরা এককালে কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্রোতকে অস্বীকার করতে না পেরে আগুনখেকো বিপ্লবী হিসেবে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে স্বাচ্ছন্দ্যময় মধ্যবিত্তসুলভ সুখী জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন তাঁদের অনেকেই। কিন্তু একথাও সত্য, শত ভ্রান্তিতে ভরা এই অভ্যুত্থান ইতিহাসে স্থান পেয়েছে সসম্মানে। কারণ এক, শিক্ষিত শ্রেণির বুদ্ধিদীপ্ত চেতনা যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় ছিল। শুধু তাই নয়, এই চেতনা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল বাঙালির মননে, যা শৌর্যের বিচারে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চাইতে কোনও অংশে কম ছিল না। আর দুই, চারু মজুমদার-কানু সান্যাল-জঙ্গল সাঁওতালদের শ্রেণি সংগ্রামের ডাক পরবর্তীকালে নিঃসন্দেহে সংক্রামিত হয়েছিল দেশের অন্যান্য প্রান্তে। হত্যাকে সংগ্রামের পথ হিসেবে কখনই সমর্থন করে না সাধারণ মানুষ। কিন্তু ইতিহাসবিদরা বলেন, বিপ্লবের বীজ কখনই ধ্বংস হয় না, আপাত নির্মূল দেখালেও যে কোনও সময় তার পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে, যে কোনও মাত্রায়। বিশাল এই ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত এক কোণে পঞ্চাশ বছর আগে ঘটে যাওয়া এক ব্যর্থ গণঅভ্যুত্থান নিয়ে আজকের দিনে আলোচনার সার্থকতা এইখানেই।

গৌতম চক্রবর্তী

একদা মাও অনুপ্রাণিত নকশালবাড়ি আজ চোরাই চিনা সামগ্রী পাচারের করিডর

শিলিগুড়ি থেকে প্রায় ৫০ মিনিটের বাসযাত্রার পথ ভারত-নেপাল সীমান্তে বলতে গেলে প্রায় একটা অখ্যাত গ্রাম নকশালবাড়ি। জনবসতির অধিকাংশই আদিবাসী। এরা এসেছিল মূলত ভারতের মধ্যভাগের অদিবাসী এলাকা থেকে। তরাই এলাকায় জঙ্গল কেটে চা-বাগিচা স্থাপনের জন্য ইংরেজ চা-বাগিচা মালিকের আড়কাঠির নানা প্রলোভনবাক্যে প্রতারিত হয়ে শ্রমিক রূপে, তারপর বাগানের কাজ হারিয়ে সরকারি খাস জমি বা চা-বাগানের পরিত্যক্ত জমিতে চাষবাসের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে শুরু করেছিল। এ ছাড়া নেপাল সীমান্ত এলাকা বলে নেপাল থেকেও এসেছিল এখানকার জনবসতির এক উল্লেখযোগ্য অংশ। আর ছিল স্থানীয় রাজবংশী, রাভা, মেচ, ধিমল ইত্যাদি জনবসতি। খাস জমি ছাড়াও ছিল জোতদারের অধীন বিশাল আয়তনের কৃষিজমি। এইসব জোতদারের মধ্যে ছিল স্থানীয় রাজবংশী এবং পরবর্তীকালে আগত কিছু বাঙালি ও মাড়োয়ারি।

১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠনের পর দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার কৃষক সভা সিদ্ধান্ত নেয়, তারা এখানকার খাস জমি দখল করে কৃষকদের মধ্যে জমি বিতরণ করবে। এখানকার কৃষকসভার সিপিএম দলের নেতা জঙ্গল সাঁওতাল-সহ চারু মজুমদার, কানু সান্যাল ও সৌরেনবাবু এই সিদ্ধান্ত নিলেও জেলা সিপিএম তার অনুমোদন দেয়নি।

১৯৬৭ সালের ২০ মে থেকে ২২ মে নকশালবাড়ির প্রসাদু জোতে প্রথম বেনামী জমি দখলের অভিযান শুরু হয়। এইসব জমির দখলদাররা ছিল তখন বাংলা কংগ্রেসের আশ্রয়পুষ্ট। বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখোপাধ্যায় তখন যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী খাস জমি দখলকারীদের উচ্ছেদে হাজির হল। ২২ মে চিনের সেই কৃষক মার্চের ভাবনাকে মনে রেখে এইসব ভূমিহীন কৃষক সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য জমা হল। ২৫ মে আদিবাসী কৃষকদের ছোড়া তিরে সোনম ওয়াংদি নামে একজন সাব-ইন্সপেক্টর নিহত হল। পুলিশের পালটা আক্রমণে দশজন আদিবাসী নিহত হল নকশালবাড়ির কাছে প্রসাদু জোতে।

এই একটি ঘটনার জেরে শুধু সিপিএমের মধ্যেই ভাঙন ঘটল তা-ই নয়, নকশালবাড়ি নামটি বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে দিল সশস্ত্র কৃষি সংগ্রামের বার্তা। প্রশ্ন অন্যখানে। এর আগেও তো পশ্চিমবাংলার কাকদ্বীপ ও তেলেঙ্গানায় এর থেকে অনেক ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল। সেই বিদ্রোহ তো এভাবে দিকে দিকে এমন বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে পারেনি। কী ছিল এখানে? কেমন করে জমা ছিল এমন বিদ্রোহের বারুদের স্তূপ? মুহূর্তের এক কৃষক বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ এমন বিদ্রোহের আগুনে যে রূপান্তরিত হয়েছিল, তার সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন। বিশেষ করে প্রসাদু জোতে যে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হল তা রাতারাতি কেন কৃষি বিপ্লবের পরিবর্তে শহুরে তরুণ মধ্যবিত্তদের কাছে ব্যক্তিহত্যার শ্রেণিসংগ্রামে রূপান্তরিত হল, তারও পর্যালোচনার প্রয়োজন। যে আন্দোলনে ন'জন আদিবাসী পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল, তারা কিন্তু উত্তরবাংলার সামাজিক বিন্যাসের পটভূমিকায় সেই অর্থে কৃষক ছিল না। এরা মাত্র কয়েক পুরুষ আগে ছিল বনবাসী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। বনভূমিতে শিকার ও বনজ ফসলের সংগ্রহের মাধ্যমে তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। পরবর্তীকালে এরা এসেছিল বাগিচা শিল্পের শ্রমিক হয়ে। কর্মচ্যুত হয়ে মাত্র কিছুদিন আগে তুলনামূলকভাবে খাস জমিতে কৃষিকাজ শুরু করেছিল। অধিকাংশ খাস জমিই স্থানীয় জোতদারের দখলে। ফলে জোতদার বনাম এইসব আদিবাসীর লড়াই জোতদারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম বলে প্রচারিত হল।

উত্তরবাংলার আদি ও প্রকৃত কৃষিজীবী বলতে পূর্ববাংলা থেকে উদ্‌বাস্তু কৃষকদের কথা বাদ দিলে বোঝায় রাজবংশী সম্প্রদায়। এরা ঐতিহ্যগতভাবে কৃষিজমি ও কৃষিকাজে এমন করে সম্পৃক্ত ছিল যে, ডুয়ার্সে বিশাল চা সাম্রাজ্য স্থাপনে বাইরে থেকে আড়কাঠির দল পাঠিয়ে শ্রমিক সংগ্রহ করতে হলেও একজনও রাজবংশীর নাম চা সাম্রাজ্যে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই রাজবংশীরা ছিল অধিকাংশই ভূমিহীন খেতমজুর। অথচ সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কৃষক হলেও রাজবংশীরা এই কৃষক বিদ্রোহে যোগ না দিয়ে এর বিরোধিতায় প্রকাশ্যে রাস্তায় নেমেছিল। নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে স্থানীয় এক রাজবংশী

> নকশালবাড়ি আন্দোলনের সেই সমস্ত অকুতোভয় মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরের মেধাবী ছাত্রদের আত্মঘাতী সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঘটনার সঙ্গে আজকের সন্ত্রাসবাদের কেমন একটা মিল যেন খুঁজে পাওয়া যায়, যদিও পটভূমি ভিন্ন। নকশাল আন্দোলন কোনও ভাবেই ধর্মীয় মৌলবাদী ভাবধারাকে প্রশ্রয় দেয়নি। তবে সন্ত্রাসবাদী মৌলবাদী সংগঠনগুলি যেমন আজ এক ভয়ংকর উন্মাদনার ঘোর সৃষ্টি করেছে তরুণদের মধ্যে তেমনই ঘোর ছিল তখনকার বিপ্লবে যোগ দেওয়ার মধ্যেও।

জোতদার সম্পদ রায়ের নেতৃত্বে শিলিগুড়ির ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করেছিল। নকশালবাড়ির কৃষি বিপ্লবের নেতারা তখন এর কারণ আত্মানুসন্ধানের তাগিদ অনুভব যে করেননি, তা অবশ্য পরবর্তীকালে সৌরিন বসু, কানু সান্যালরা স্বীকার করেছেন।

১৯৬০-৭০ দশকে সারা রাজ্য জুড়ে যে নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা কিন্তু প্রথমে লিন পিয়াওয়ের সেই গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার পথ অনুসরণ করার পর সেই বিপ্লবের উৎসকেন্দ্র বিপরীতমুখী হয়ে শহরে ব্যক্তিহত্যার শ্রেণিসংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল। কৃষকের অস্ত্র তুলে নেওয়ার পরিবর্তে শহরের মূলত এলিট শ্রেণির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে বুর্জোয়া সরকারের প্রতিনিধি রূপে ট্রাফিক পুলিশ, সাধারণ কনস্টেবল, এমনকি বিরোধী ভাবনার মধ্যবিত্ত শিক্ষক ও রাজনৈতিক কর্মীরাও তাদের শ্রেণিশত্রুর খতম তালিকায় উঠে এল। দিল্লির লাল কেল্লায় কৃষক বিপ্লবের লাল পতাকা উত্তোলনের দখলের পরিবর্তে দেওয়ালে শোধনবাদী আর নয়া শোধনবাদী লেখার লড়াইয়ের দখল নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রামের নেমে শ্রেণি নিধন শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যে পালটে গেল শ্রেণির সংজ্ঞা। পুলিশের দালাল সন্দেহে বহু সাধারণ মানুষ কোনও অচেনা জায়গায় কালেই শ্রেণি নিধনের নামে প্রাণহীন হয়ে পড়ে থাকল।

অথচ এই নকশাল আন্দোলনে যারা যোগ দিয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র। নিজেদের সুখী ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগকে হেলায় ঠেলে দিয়ে তারা এই শ্রেণিশত্রু নিধনের তথ্যকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে নিজের জীবনকে পায়ের ভৃত্য করে এভাবে ব্যক্তিহত্যার রাজনীতিতে নিজেদের সঁপে দিয়েছিল। রাজপথে কর্তব্যরত ট্রাফিক কনস্টেবলকে প্রকাশ্যে হত্যা করে এই দেশ থেকে এক শ্রেণিশত্রুকে নির্মূল করে কৃষি বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে করত তারা। এরা জানত না, মুহূর্তের ভুল বা অনবধানবশত সেই পুলিশের গুলিই তাদের বুক ভেদ করে চলে যাবে। তাদের ভাবনা চূড়ান্ত ভুল হতে পারে, তবে তাদের সেই বিশ্বাসের মধ্যে ছিল না কোনও শঠতা। তারা যা করেছে তা তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই করেছে। সে দিনের সেই নকশালবাড়ির ঘটনা যতই হঠকারিত্বের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মাধ্যমে নকশালবাড়ির প্রসাদু জোতের সীমা ছাড়িয়ে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ুক না কেন, তাকে প্রকৃতপক্ষে কৃষক বিদ্রোহ বলা যায় কি না তা নিয়ে ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভেদের মূল কেন্দ্র চিন ও তার মুখপত্র 'পিকিং রেডিয়ো' প্রসাদু জোতের এক পুলিশ নিধনসহ শ্রেণিশত্রুর নামে ব্যক্তিহত্যার রাজনীতিকে ৫ জুলাই ১৯৬৭ থেকে 'Spring Thunder in India' বলে বিপ্লবের ঝড় হিসেবে প্রচার শুরু করলেও এর নেতৃত্ব যে শহরের কিছু মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তের পরিবারের যুবকদের হাতে সীমাবদ্ধ ছিল, সেটা যেন তারা দেখেও দেখতে চাইল না। একইভাবে হঠকারী পরামর্শ দিয়ে তারা অ-কমিউনিস্ট দেশগুলির মধ্যে বৃহত্তম ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে তারই সহযোগী সুযাকর্ন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথে নামিয়ে দিয়েছিল। পরিণতিতে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান আইদিতিসহ ছ'লক্ষ কমিউনিস্ট সদস্য ও সমর্থককে দক্ষিণপন্থী সামরিক বাহিনী ডোডো পাখির মতো বিনা প্রতিরোধে বধ্যভূমিতে এনে হত্যা করল।

শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' লেখার উন্মাদনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিহত্যার শ্রেণিসংগ্রামকে ভারতের মুক্তিসূর্যের পথ বলে ধরে নিল। একই সঙ্গে প্রবল শক্তিশালী রাষ্ট্রশক্তি তাদের হিংস্রতা নিয়ে এদের তো বটেই, নিছক সন্দেহের বশে নির্বিচারে হত্যা ও জেলে বীভৎস অত্যাচারের মাধ্যমে

এখন ডুয়ার্স ক্যামেরা ক্লাব

অগাস্ট ১, ২০১৬ থেকে চালু হয়ে গেল 'এখন ডুয়ার্স ক্যামেরা ক্লাব'। ডুয়ার্সের প্রকৃতি, মানুষ, বন্যপ্রাণ ও নানাবিধ ঘটনাকে ফ্রেমে বন্দি করার সংঘবদ্ধ প্রয়াস। ছবি তোলা যাদের নেশা তারা যে কেউ এই ক্লাবের সদস্য হতে পারেন।

- এক বছরের সদস্য চাঁদা ৫০০ টাকা।
- সদস্যদের সচিত্র পরিচয় পত্র দেওয়া হবে।
- সদস্যরা তাঁদের বাছাই করা ছবি নিয়মিত পাঠাতে পারবেন অন লাইন-এ।
- মাসে একবার আড্ডাঘরে সদস্যদের বৈঠক বসতে পারে। সেখানে বাছাই করা ছবি দেখা ও আলোচনার ব্যবস্থা থাকবে।
- ত্রৈমাসিক ওয়ার্কশপ-ফটোওয়াক হবে অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফারের তত্ত্বাবধানে।
- বাছাই ছবি নিয়ে কলকাতায় ও জলপাইগুড়িতে বছরে দু'বার চিত্র প্রদর্শনী হবে।
- নির্বাচিত ছবি 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ছবি প্রতি সম্মান দক্ষিণা পাবেন চিত্রগ্রাহক। বছরে দু'বার এই দক্ষিণা সাকুল্যে দেওয়া হবে।
- পাঠানো ছবি ফেসবুক বা অন্য কোথাও ব্যবহার করা যাবে না।
- সদস্য হতে গেলে চেক পাঠাতে হবে Ekhon Duars নামে।
- আরও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগঃ অমিতেশ চন্দ। আড্ডাঘর। মুক্তাভবন। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি। ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭।

> ’৬০-’৭০ দশকে এককালের শিল্প-রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক শিল্প প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একদা হোসিয়ারি শিল্পের রাজধানী বলে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গ থেকে সেই শিল্প স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছে অন্য রাজ্যে। সারা দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি থমকে গিয়েছে। চাকরির সম্ভাবনা প্রায় শূন্যে। স্কুল-কলেজের ডিগ্রি নিয়ে দরজায় দরজায় ঘুরে, চাকরির সন্ধানে ক্লান্ত হয়ে, বাড়িতে অভাবী পরিবারের সদস্যদের ম্লান মুখ দেখে তাদের মন জুড়ে নেমে এসেছিল হতাশা।

ভারতের গণতন্ত্রকে রক্ষার দায়িত্ব নিল।

এই নকশালবাড়ি আন্দোলনের সেই সমস্ত অকুতোভয় মধ্যবিত্ত, এমনকি উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরের মেধাবী ছাত্রর এইভাবে আত্মঘাতী সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঘটনার সঙ্গে আজকের আইএসআই সন্ত্রাসবাদের কেমন একটা মিল যেন খুঁজে পাওয়া যায়, যদিও পটভূমি ভিন্ন। নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা বা নকশাল তথা সিপিআই (এমএল) (পরে অবশ্য নিজস্ব পরস্পর বিরোধী ভাবনার সংঘাতে অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত) কোনও ভাবেই ধর্মীয় মৌলবাদী ভাবধারায়কে প্রশ্রয় দেয়নি। তবে ঐস্লামিক সন্ত্রাসবাদী মৌলবাদী সংগঠনগুলি যেমন এক ভয়ংকর ধর্মীয় উন্মাদনার ঘোর, যাকে বলা হয় ‘Religious fanatism’, সেই নেশার মাদক সেবন করিয়ে এক মুসলিম বিশ্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নিল ভাবনায় আত্মঘাতী হতে নির্দ্বিধায় এগিয়ে দেয়, তেমনি এক রাজনৈতিক ফ্যানাটিজম সে দিন টেনে এনেছিল এইসব অসংখ্য তরুণকে। স্বপ্ন দেখিয়েছিল, ব্যক্তিহত্যার সন্ত্রাস ও কয়েকটি রাইফেল ছিনতাই করে যে অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তুলবে, তার সাহায্যেই তারা এই প্রবল শক্তিশালী রাষ্ট্রশক্তিকে উচ্ছেদ ঘটিয়ে এখানে প্রলেতারিয়েত রাজ কায়েম করে মুক্তির সূর্যকে দেশের আকাশে উপস্থিত করতে পারবে। তাদের মাথার উপর ‘চিনের চেয়ারম্যান তাদেরও চেয়ারম্যান’। হাতে সেই মৌলবাদীদের হাতে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় ধর্মগ্রন্থের বাণীর মতো ‘রেড বুক’। প্রচারে ‘পিকিং রেডিয়ো’।

একটা কথা স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসতে পারে, কৃষক বিপ্লবে দলে দলে কৃষকের পরিবর্তে শহুরে মধ্যবিত্ত ঘরের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এতগুলি তরতাজা তরুণ কেন এমন স্বপ্নের বুদ্বুদে ভাসতে ভাসতে এভাবে মৃত্যুর মুখে দাঁড়াতে প্রেরণা পেল?

এই প্রশ্নে ’৬০-’৭০ দশকে দেশের তথা এ রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে এক পলক দৃষ্টিপাত করা যাক। এককালের শিল্প-রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক শিল্প প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একদা হোসিয়ারি শিল্পের রাজধানী বলে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গ থেকে সেই শিল্প স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছে অন্য রাজ্যে। সারা দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি থমকে গিয়েছে। চাকরির সম্ভাবনা প্রায় শূন্যে। স্কুল-কলেজের ডিগ্রি নিয়ে

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:12,000
Full Page, B/W: 8,000
Half Page, Colour: 7,500
Half Page, B/W: 5,000
Back Cover: 25,000
Front Inside Cover: 15,000
Back Inside Cover: 5,000
Double Spread: 20,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {19.5cm (W) X 27 cm (H)}, Non Bleed {16.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {16.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {8 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 16.5 cm (W) X 7.5 cm (H), 1/4 Page 8 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {5cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2016 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

দরজায় দরজায় ঘুরে, চাকরির সন্ধানে ক্লান্ত হয়ে, বাড়িতে অভাবী পরিবারের সদস্যদের ম্লান মুখ দেখে তাদের মন জুড়ে নেমে এসেছে হতাশা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির কাগজ তাদের কাছে ছেঁড়া কাগজ বলেই মনে হয়েছে। ব্রিটিশ শাসকের কেরানি প্রস্তুতির পাঠ্যক্রমের পরিবর্তনের তাগিদ স্বাধীন ভারতের রূপকারদের মনে আসেনি। তাই এই শিক্ষাব্যবস্থা 'বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা'— একে জ্বালিয়ে দেওয়া, পুড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান তাদের কাছে যে আকর্ষণীয় হবে— এতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।

অপর দিকে এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, কিছু উচ্চবিত্ত তথা আমলার ঘরের তরুণরা সে দিন ওই ব্যক্তিহত্যার শ্রেণিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এদের কাছে হতাশাটা এসেছিল অন্যভাবে। বাবা উচ্চপদস্থ আমলা। অনেকেই ঘুষের টাকায় বেহিসেবি জীবনযাত্রা করছে। মা সোসাইটির মহিলা, ক্লাব-পার্টি জীবনে অভ্যস্ত। সন্তানদের প্রতিপালনের সময় তাঁদের নেই।

উচ্চবিত্ত তথা আমলাদের সন্তানদের চোখে সমাজের অভিভাবকদের নানা দুর্নীতি খুব সহজেই চোখে পড়ে। যারা সেই পাঁকের প্রবাহে সাঁতার কাটাতে চায়নি, তাদের মনে এই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা বিজাতীয় ঘৃণা বিক্ষোভের আগুনে রূপান্তরিত হয়। মনে হতে থাকে, যা কিছু আছে সবই অপসংস্কৃতি। তাকে ধ্বংস করো। একসময় যেমন শাসকদল কংগ্রেসের নেতার ছেলে পিতার দ্বিচারিতার জনসভায় ভাষণ আর তাঁর ব্যবহারিক জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত ছবিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতাদের জীবনযাত্রা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যোগ দিত কমিউনিস্টদের কঠিন জীবনযাত্রা বা কমিউনে, তেমনি এইসব উচ্চবিত্ত পরিবারের অনেক তরুণ এই সমাজে যা কিছু আছে তা-ই বুর্জোয়া সংস্কৃতি জেহাদে নকশালবাড়ির এই আত্মত্যাগী এবং আত্মঘাতী শ্রেণিসংগ্রামের মধ্যে এই সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করার পথ মনে করেছিল। তাই যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল জোতদারের হাত থেকে জমি দখলের মধ্যে কৃষক বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে তা শহরে এসে, ট্রাফিক কনস্টেবল থেকে শিক্ষক— যে কোনও বিরোধী দলকেই নির্মূল করা নয়, বিদ্যাসাগর, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের মতন বুর্জোয়া ব্যক্তিত্বের মূর্তি ভাঙার আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল।

প্রশ্ন, সেই নকশালবাড়ির বর্তমান অবস্থাটি কেমন? শিলিগুড়িতে বেড়াতে আসা অনেক বন্ধুই অনুরোধ করেন, দুনিয়া কাঁপানো সেই নকশালবাড়ি জায়গাটি যেমন ইতিহাসের পাতায় একটা স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে, তেমনি নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে এখনও আছে এক কৌতূহলী আবেগ।

৫০টি গ্রাম নিয়ে গঠিত ৬০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের দার্জিলিং জেলার এক প্রান্তভূমি নেপাল সীমান্তে এই নকশালবাড়ি ব্লক। শিলিগুড়ি থেকে বাসে যেতে সময় লাগে ৪০-৫০ মিনিট। সীমান্তের পাশ দিয়ে বয়ে চলা মেচি নদীর ওপারেই নেপাল। এখান থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে টুলাবাড়ি। মেচি নদীর সেতু পার হলেই পৌঁছে যাওয়া যায় বিদেশি দ্রব্যের ছোট্ট কিন্তু গমগমে বাজারে। নামে নেপাল হলেও এখানকার দোকানপাটের অধিকাংশ মালিক ভারতীয় বেনিয়া সম্প্রদায়। দোকানের নামগুলিও ভারতীয়— অম্বর, শিবসাগর, ধনেশ স্টোর্স, জয় বজরঙ্গবলী স্টোর্স, শ্যাম কুঞ্জ, গীতা কুঞ্জ ইত্যাদি।

এখন খোলা বাণিজ্যিক নীতিতে চিন, হংকং, কোরিয়া, জাপান ইত্যাদির মতন বিদেশি দ্রব্য খোলা বাজারে সহজলভ্য। কিছুদিন আগেও তা ছিল না। এই সমস্ত বিদেশি সামগ্রীকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে যে হংকং মার্কেট গড়ে উঠেছিল, সেটা আজও ভিন্ন রাজ্য থেকে আসা পর্যটকদের আকর্ষণের বাণিজ্যিক কেন্দ্র।

যে নকশালবাড়িতে ১৯৬৭ সালের বিদ্রোহের গর্ভযন্ত্রণায় সেখানকার আদিবাসী মহিলারা বন্দুকের গুলিতে জীবন দিয়েছিল, সেই নকশালবাড়ির বাস থেকে এখন দলে দলে দেহাতি মহিলাদের নামতে দেখা যায় পোয়াতির মতো স্ফীত উদর নিয়ে। হিলকার্ট রোডের বিধান মার্কেটের মোড়ে নেমেই তারা যেন 'প্রসবযন্ত্রণা'য় ছুটে যায় হংকং মার্কেটের দিকে। পেটের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে 'প্রসব' করে বিদেশি ইলেকট্রনিক দ্রব্য, পোশাক ও নানা আকর্ষণীয় সামগ্রী, যা নেপাল হয়ে বেআইনি চোরাপথে ঢোকে ভারত সীমান্তে। যার বেশিরভাগটাই আসে মাও জে দং-এর দেশ থেকে। যে মাও ছিলেন সে সময়ের সংগ্রামের যাবতীয় অনুপ্রেরণা, সে মাও-এর দেশ থেকে চোরাচালান হয়ে আসা সামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক, এমনকি জঙ্গি প্রশিক্ষণের অত্যাধুনিক কৌশল ইত্যাদির সাক্ষী থাকে আজকের নকশালবাড়ি। পথচলতি মানুষের কাছে যা অতি স্বাভাবিক দৈনন্দিন চিত্র। গোয়েন্দাদের চোখে যা অতি শঙ্কাজনক পরিস্থিতি। তাত্ত্বিকদের মতে যা ইতিহাসের নির্মম পরিহাস। 'তোমার বাড়ি আমার বাড়ি নকশালবাড়ি' এখন সুদূর অতীতের স্মৃতি হয়ে পুরনো বাসিন্দাদের কানে ক্ষীণ হয়ে মাঝেমধ্যে হয়ত ভেসে আসে।

সৌমেন নাগ

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
মিনি বুক স্টোর ০৩৫৬-২২৫৫০১৫
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯৯৩২৫৩৪৮৮৫
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৭৪৯৩৭৬৪৯৫
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

ঘুঙুর দাদু মাপ করে দিও আমাদের

আজ যাঁরা প্রবীণ নাগরিক, তাঁরা কৈশোরে জলপাইগুড়ি শহরের এক সৌম্যদর্শন সদাহাস্যময় ফেরিওয়ালার কথা কখনও ভুলতে পারবেন না। তাঁকে ফেরিওয়ালা সম্ভাষণ করলে কেমন যেন দূরের মানুষ মনে হয়, অসম্মানও করা হয়। তিনি যে শহরের প্রিয় দাদু। টকটকে ফরসা গায়ের রং। কপালে চন্দনের তিলক। হলুদ রঙের ধুতি, পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি, পায়ে কেডস জুতো এবং ঘুঙুর। ঝমঝম শব্দে ছন্দোময় তাঁর পথ চলা। হাতে সাইকেল ধরা। তাতে পিছনের ক্যারিয়ারে ঝোলানো দু'টি হলুদ বাক্স ভরা চানাচুর। দাদুর ভাজা।

হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো দাদুর ঘুঙুরের শব্দে শিশুরা ভিড় করে আসে। গুটিগুটি এসে দাঁড়ায় বাড়ির বড়রা। এক আনা বা দু'আনার প্যাকেট নিমেষে সবার হাতে। একদম নিজের রেসিপি। মুচমুচে এবং অসম্ভব মুখরোচক। ওই মানুষটির সঙ্গে ব্যবসার শুরু থেকেই শহরের প্রবল পরিচিতি। আর কৃষ্ণসুলভ দর্শন, সঙ্গে উজ্জ্বল পোশাক মানুষকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত।

তাঁর জীবন এক খোলা ক্যানভাস। নাম গোবিন্দচন্দ্র পাল। পূর্ববঙ্গের কুষ্টিয়া জেলায় জন্ম। এখন বয়স সাতানব্বই। বারো বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ। তাঁর জীবন পালটে গেল। মাসি-পিসিদের বাড়িতে শৈশব। ক্লাস থ্রি-তেই পড়াশোনায় ইতি। আঠারো বছর বয়সে বাবার আবার বিয়ে।

নতুন মা কিছুদিন পর থেকেই কটু কথা শোনাতেন। গঞ্জনা সইল না। কামাখ্যাগুড়িতে চলে এলেন। একজন পরিচিত ছিলেন— সুরেন্দ্রনাথ পাল। তাঁর মিষ্টির দোকানে মাসিক আট টাকা বেতনে কাজ পেলেন। বাবার কথা ভেবে কষ্ট পেতেন। মন বসছিল না। কাজ ছেড়ে বাড়ি যাচ্ছিলেন। নেমে পড়লেন আলিপুরদুয়ারে। আশ্রয় পূর্বপরিচিত পটল পালের বাড়ি। আবার আট টাকা মাইনের চাকরি। এটাও মিষ্টির দোকান। সকাল সাতটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনি। ওখানে লাল পোশাক পরে একটা লোক 'চটপটি ঝটপটি' নামে ভাজা খাবার ফেরি করে বিক্রি করত। তার ঝুড়ি নিমেষে ফাঁকা হত।

আলাপ হল যশোদালাল সাহার সঙ্গে। তাকে মামা ডাকতেন। তার কাছে আশ্রয় চাইলেন নিজে ব্যবসা করবেন— এই

উদ্দেশ্যে। মামিকে ম্যানেজ করে থাকার জায়গা পেলেন। প্রথম দিন আড়াই সের পাঁপড় বিক্রি করে দু'টাকা লাভ করলেন। আলিপুরদুয়ারের মানুষ তাঁকে ভালবাসত। সেই সময় তিনি ব্যাঙ্কে বই করে পয়সা জমাতেন। খবর এল, বাবা কষ্টে আছেন। কুষ্টিয়া থেকে তাঁদের নিয়ে এলেন। বাড়ি ভাড়া করলেন। সুখ সহ্য হল না। সৎমা খারাপ ব্যবহার শুরু করল।

আবার গৃহত্যাগ। জলপাইগুড়ি আসবেন ঠিক করে তিনি চলে গেলেন কলকাতায় ভাগনের কাছে। কয়েকদিন থেকে বেলুন ও পুতুল কিনে ফিরলেন জলপাইগুড়ি। উঠলেন হিন্দু নিবাস হোটেলে। বাঁশের বাতায় বেলুন ও পুতুল ঝুলিয়ে শুরু হল ফিরি করা। অনেক চেষ্টায় একটা অপরিসর ঝুপড়ি ঘর মিলল স্টেশনের পাশে। আলিপুরদুয়ার গেলেন জিনিসপত্র আনতে। সাত দিন পর সকালে বার্নিশ পৌঁছে শুনলেন, মহাত্মা গান্ধিকে হত্যা করা হয়েছে, শহরে আসার গাড়ি নেই। কোনওমতে বাড়ি ফিরলেন। তিন মাস ব্যবসা করে এক হাজার টাকা লাভ হল। তাঁকে পান্ডাপাড়ার মোহনবাঁশি বণিক বিশেষ স্নেহ করতেন। তাঁর কাছে বাড়ি ভাড়া চাইলেন। আইবুড়ো ছেলেকে কে দেবে বাড়ি? মোহনবাবু তাঁকে বিয়ে করতে বললেন। আবার চললেন কুষ্টিয়ার বন্ধুর কাছে। পাত্রী চাই। তাঁর থেকে আট বছরের ছোট এক গরিব সুশ্রী কন্যার সঙ্গে বিয়ে সম্পন্ন করে ফিরে এলেন জলপাইগুড়ি, হাতে দু'টাকা পুঁজি। মোহনবাবু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। বাকিতে মালপত্র কিনে শুরু হল চানাচুর তৈরি ও ফিরি। গলায় সুর করে গান— 'কোথায় রে সব পোলাপান, /মায়ের থেকে পয়সা আন।/ মা পয়সা না দিলে আঁচল ধরে টান,/কোথায় রে সব পোলাপান।'

স্টেশন থেকে দিনবাজার যাওয়ার আগেই ব্যাগের সব চানাচুরের প্যাকেট শেষ। দাদু নামটি বাচ্চাদের প্রিয়, তাই চানাচুরের নাম 'দাদুর ভাজা'। পরে বেশি মাল বহনের জন্য সাইকেল। প্যাডেল থাকলে হাঁটতে অসুবিধা, তাই প্যাডেলবিহীন সাইকেল।

এখন আর স্মৃতি সাথ দেয় না। কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল। অবনী ডাক্তার, বিভূতি ঘোষ, ডা. অনুপম সেন, কবি মোহিত ঘোষ, রবি শিকদার— এমন অনেক বড় মানুষ তাঁকে ভালবাসতেন। সন-তারিখ মনে থাকে না। তবে স্বাধীনতার দিনটি ও তারিখ মনে আছে। রাত বারোটায় ভারতের জাতীয় পতাকা তোলা হয়েছিল। বাজি পুড়েছিল, আবির খেলা এবং মিষ্টি বিতরণ হয়েছিল। দেশভাগের যন্ত্রণায় তাঁর হৃদয় রক্তাক্ত হয়।

আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি ২৯ মে ২০১৬ তারিখে। স্নানে যাচ্ছিলেন। স্নান ফেলে রেখে দীর্ঘ সময় গল্প করেছিলেন। আসলে গল্প করার মানুষ নেই। কখনও কখনও বড় একা লাগে। গত প্রায় কুড়ি বছর সাইকেল ঠেলে 'দাদুর ভাজা'র প্যাকেট নিয়ে আর শহরের পথে তাঁকে দেখা যায় না। শোনা যায় না তাঁর ঘুঙুরের ঝুমঝুম শব্দ।

এক নবীনা বধূ হয়ে এসেছিলেন অল্প বয়সে। দীর্ঘ সত্তর বছর সংসার করেছেন। দু'বছর হল তিনি দেহ রেখেছেন। চিরজীবনের সাথি চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে। দাদুর দু'চোখ জলে ভরে আসে। বলছিলেন, এখন শুধু তাঁর কথা ভেবেই সময় কাটে। ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ। পরপারে মনের মানুষ প্রত্যাশায় বসে। দাদুর চোখে জল, কিন্তু কণ্ঠ সুরেলা। গেয়ে ওঠেন, 'পৃথিবী আমারে চায়, রেখো না বেঁধে আমায়...'

২৯ মে ২০১৬ তারিখে যে দিন দাদুর সঙ্গে কথা বলতে যাই— কথা দিয়ে এসেছিলাম, লেখা পত্রিকায় প্রকাশ হলে সংখ্যাটি নিজে গিয়ে দাদুর হাতে তুলে দিয়ে আসব। সে দিন বুঝিনি দেড় মাসের মধ্যে তিনি নিজেই পরলোকে পাড়ি দেবেন। তবে পরলোক যদি থাকে, সেখানে তাঁর দয়িতার সঙ্গে অবশ্যই মিলন হবে। লেখাটি প্রকাশে দেরির জন্য বিদেহী দাদুর কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি।

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

উন্নয়ন মন্ত্রীর দরবার

পাঠকের মুখোমুখি

দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসার পর উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রত্যাশা সরকারের প্রতি বেশ কয়েক গুণ বেড়ে গেছে, বলাই বাহুল্য। উত্তরের সাতটি জেলার মানুষের মনে ভরসা জেগেছে গত পাঁচ বছরে উন্নয়নের খতিয়ান দেখে। হতাশাও জমে রয়েছে বহু এলাকায়। পাওয়া না-পাওয়ার যুগে মানুষ দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদির চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্ব দেয় নিজের ও এলাকার উন্নয়নকে। 'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে উত্তরের মানুষের বাছাই কিছু প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছিল নবগঠিত রাজ্য সরকারের নতুন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর সামনে।

সাংবাদিকের নেওয়া কোনও প্রচলিত সাক্ষাৎকার নয়, উত্তরের মানুষের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হয়েছেন মন্ত্রী **রবীন্দ্রনাথ ঘোষ**। এই সংখ্যা থেকে যার সূচনা হল, প্রত্যেক মাসে 'এখন ডুয়ার্স'-এর পাঠকদের পাঠানো প্রশ্নের উত্তর দেবেন তিনি। নতুন প্রশ্ন তো বটেই, মন্ত্রীর দেওয়া উত্তরের পাল্টা প্রশ্নও করতে পারেন পাঠক।

প্রশ্ন- উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে আপনার দায়িত্ব কি কেবল বরাদ্দ অর্থের বন্টন ও পরিকল্পনা রূপায়ণ? কর্মসংস্থান, বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের অগ্রগতির তদারকি, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও আয়ের সংস্থান ইত্যাদির দায়িত্ব কি আপনার দপ্তরের উপর বর্তায় না? এ নিয়ে আপনার ভাবনা এই মুহূর্তে কী রয়েছে?

উত্তর- কখনই না। আমাদের যে ৪৪টা দপ্তর রয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কিন্তু নির্দিষ্ট কোনও কাজ নেই। ওই ৪৪টা দপ্তরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে পারস্পরিক সমন্বয় রেখে আমাদের কাজ করতে হয়।

বাম জমানায় গ্রামের মানুষের মধ্যে যে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাবার প্রবণতা বেড়েছিল, বিগত ৫ বছরে তা অনেকাংশে কমেছে। আমাদের রাজ্যে কর্মসংস্থান বাড়ার ফলে মানুষ আবার ঘরে ফিরছে। উত্তরবঙ্গের ৭০ শতাংশ কৃষক তাদের কৃষিজমিতে সেচের ব্যবস্থাসহ সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা পাচ্ছে। সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে সেচের জল চাষের জমিতে দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মুরগি পালন, হাঁস পালনসহ চাষের জমিতে স্বল্পকালীন মাছ চাষের ব্যবস্থা করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে।

একইভাবে মুখ থুবড়ে পরা পর্যটন শিল্পের উপর মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী জোর দেওয়ায় সেখানে অনেক কাজ করা হয়েছে। ফলে আমাদের উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পে ঢল নেমেছে। এখানে পর্যটকরা এসে যথেষ্ট খুশি মনে ফিরছে। আমরা চাইছি পর্যটকরা এখানে আসুক। তারা উত্তরবঙ্গকে চিনুক, উত্তরবঙ্গকে জানুক। এতে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষের কর্মসংস্থান হবে। তাই এবার পুজোয় আমরা চাইছি পর্যটকরা উত্তরবঙ্গে আসুক।

শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা জানি এখানে অনেক কৃষিজাত শিল্প করার সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে আনারস, আম, ভুট্টা, টমাটো, কাঁচা লঙ্কাসহ নানা রকম কৃষিজাত সামগ্রী রয়েছে। সেখানে আরও ফুড প্রসেসিং সেন্টার করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। যার থেকে শিল্পায়নটা হতে পারে। এতে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি রাজস্বও আসবে। সেটা ভারী শিল্প না হলেও ছোট শিল্প হওয়ার সম্ভাবনা ও পরিকাঠামো রয়েছে। শিল্পের জন্য যে দুটো জিনিস দরকার— বিদ্যুতের সুলভতা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, তা-ও এখানে আছে। এছাড়াও রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গে শিল্প স্থাপনের জন্য একটা বিশেষ ছাড়ের সুযোগ দিয়েছেন। কোচবিহারে ৫০ শতাংশ, অন্যান্য জেলায় ৩০ শতাংশ করে ভর্তুকির ব্যবস্থা করেছে।

এবার চা শিল্পের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। বন্ধ হওয়া চা-বাগানগুলো ধীরে ধীরে খোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। 'টি ডায়রেক্টরেট' গঠন করা হয়েছে। যাতে চা শ্রমিকরা আর বঞ্চিত না হয়। পাশাপাশি আমরা ছোট ছোট নদীর উপর ব্রিজ তৈরি করে রোড কানেকটিভিটি বাড়াতে চাইছি। কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি মানে একটা সার্বিক উন্নয়নের দিকে অনেক ধাপ এগিয়ে যাওয়া।

আমাদের রাজ্যে কর্মসংস্থান বাড়ার ফলে মানুষ আবার ঘরে ফিরছে। উত্তরবঙ্গের ৭০ শতাংশ কৃষক তাদের কৃষিজমিতে সেচের ব্যবস্থাসহ সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা পাচ্ছে। সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে সেচের জল চাষের জমিতে দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মুরগি পালন, হাঁস পালনসহ চাষের জমিতে স্বল্পকালীন মাছ চাষের ব্যবস্থা করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন- জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার অরণ্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ, জল সম্পদ ইত্যাদির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে এই দুই পিছিয়ে পড়া জেলার উন্নয়ন সম্ভব?

উত্তর- এখানে প্রচুর জল সম্পদ রয়েছে। কিন্তু জল বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট অনুযায়ী এখানে জল স্তর অনেক নিচে নেমে গিয়েছে। তাই মুখ্যমন্ত্রী সারা দেশেই 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্প চালু করতে বলেছেন। এখানে ভুটান পাহাড় থেকে ৭২টা নদ নদী উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়ে বইছে। ভুটান থেকে অনেক সময় অপরিকল্পিতভাবে জল ছেড়ে দেয়। ফলে সমস্যায় পড়তে হয় উত্তরবঙ্গের মানুষকে। এই জল ধরে রেখে সারা বছর যাতে সেচের কাজে বা মাছ চাষে ব্যবহার করা যায় তা এবং এই জল থেকে সৌরবিদ্যুত তৈরি করার জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। এর জন্য অবশ্য ভুটান সরকারের সঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন।

উত্তরবঙ্গে তো অরণ্যের প্রাচুর্য রয়েছেই, তাকে আরও ভালভাবে গড়ে তোলার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। বিরল প্রজাপতির গাছ নতুন করে লাগাতে চাই। এছাড়াও অর্থকরী গাছ লাগিয়ে অরণ্য সম্পদ বাড়াতে চাই।

প্রশ্ন- শুনেছি মালদায় দলের ফল খারাপ হওয়ায় নেত্রী যথেষ্ট বিরক্ত। আগের উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে শুনেছি গত পাঁচ বছরে মালদার উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট খরচ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আশানুরূপ ফল না হওয়ায় এবার মালদা জেলার জন্য বরাদ্দ কি কম হবে, নাকি আরও বেশি করার কথা ভাবা হচ্ছে? মালদা জেলার উন্নয়নের কী কী আশু পরিকল্পনা আপনার হাতে বা মাথায় আছে?

উত্তর- না না, নির্বাচনের ফলাফলের সঙ্গে উন্নয়নের কোনও সম্পর্ক নেই। মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। তা তারা অবশ্যই পাবে। মালদাও উন্নয়নের সমান ভাগীদার। সেই জেলার ডিএমও, জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে তাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনের ভিত্তিতে বাজেটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা সমস্যা মেটাবো। মালদার ফুলহার নদীর ভুতনির চরে প্রায় ২ কিলোমিটার সেতু নির্মাণ হচ্ছে। এতে এক লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে।

প্রশ্ন- আপনার সাম্প্রতিক সফর উত্তর দিনাজপুরের মানুষকে উজ্জীবিত করেছে বলেই জানা গিয়েছে। দীর্ঘ অবহেলিত এই জেলার উন্নয়নে যেসব পরিকল্পনা আপনার হাতে এসেছে, তার মধ্যে কোনগুলিকে আপনি প্রাধান্য দিচ্ছেন?

উত্তর- অনেক কাজই করার আছে এখানে। প্রধান প্রয়োজন রাস্তাঘাটের, অনেক জায়গায় ছোট ছোট কালভার্ট, ব্রিজের প্রয়োজন। সেগুলো করতে হবে। এই জেলায় আই আই টি কলেজ তৈরি করা হচ্ছে। বালুরঘাটের কাছে এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরি করা হচ্ছে। রায়গঞ্জে রবীন্দ্রভবন সংস্কার করা হয়েছে। একটা নাট্য উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে, তার কাজ প্রায় শেষের দিকে। শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লী নির্মাণও করা হল সেখানে।

এছাড়া রায়গঞ্জে কুলিক পাখিরালয় রয়েছে। এশিয়া মহাদেশে এতবড় পাখিরালয় আর নেই। আমি সেখানকার ডিএমও, ডিএফও-কে অনুরোধ করেছি, এটাকে আরও সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে। পাখিদের খাবারের জন্য ফলমূলের চাষ করা যেতে পারে। সেখানে একটি প্রজাপতি ও কচ্ছপের পার্ক করা যায় কিনা সে নিয়েও চিন্তা ভাবনা চলছে। ঝিলগুলো সংস্কার করার কথাও হয়েছে। যাতে সেখানে মানুষ বসতে পারে।

এছাড়াও দুই দিনাজপুরেই হস্তশিল্প

রয়েছে বিশেষ করে মাদুর শিল্প। এইসব হস্তশিল্পকে বিদেশে রপ্তানী করার জন্য বিভিন্ন এক্সপোর্টারদের সঙ্গে কথা বলে তাকে বাজারজাত করতে চাই। এক কথায় জেলাটির সার্বিক উন্নয়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিতে চাই।

প্রশ্ন- **দক্ষিণ দিনাজপুরের উন্নয়নের ভার কি পুরোটাই রাষ্ট্রমন্ত্রীর উপর ছেড়ে দিয়েছেন?**

উত্তর- এরকম তো ছেড়ে দেওয়া হয় না... আমরা তার সহযোগিতা চাইছি। সে সেখানকার স্থানীয় মানুষ, জেলার সব কাজকর্ম দেখাশোনা করা, ডিএম-এর সঙ্গে আলোচনা করা, আরও কীভাবে উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা, এলাকার মানুষের কী প্রয়োজন তা জানা এবং আমাকে জানানো— এই ধরনের সাহায্য তার কাছে আশা করছি।

প্রশ্ন- **উত্তরকন্যা-কোচবিহার নিয়মিত যাতায়াতের পথে নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে শিলিগুড়ি থেকে তিস্তা ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তার হাল বেশ খারাপ হয়েছে। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার মানুষকেও ওই পথে যাতায়াত করতে হয়। নিত্যযাত্রীদের আশঙ্কা আবার রাস্তা পুরনো ভয়াবহ দিনগুলিতে ফিরে না যায়, চলাচলের অযোগ্য না হয়ে উঠে। নিত্যযাত্রী হিসেবে এই রাস্তা আবার সুগম হয়ে উঠবে কবে?**

উত্তর- এই রাস্তাটা আসলে ৩১ নং জাতীয় সড়ক। আমরা এটা করি না। অস্থায়ীভাবে এক বছর আগে মেরামত করা হয়েছিল। কিন্তু রাস্তা এখন চওড়া করা হচ্ছে, তার ফলে নিত্যযাত্রীদের একটু অসুবিধা হচ্ছে। আর ভারী বর্ষণ ও ভারী গাড়ি, ট্রাক ইত্যাদি চলাচলের জন্য রাস্তাটা বেশিদিন টেঁকানো সম্ভব হয়নি। তবে রাস্তাটা যখন প্রশস্ত হবে, উন্নতমানের কাজ শেষ হবে তারপর এই রাস্তা বহুদিন স্থায়ী হবে আশা করি।

প্রশ্ন- **জিটিএ-এর বাইরে পাহাড়ে কতটুকু উন্নয়ন করা আপনার পক্ষে সম্ভব? কালিম্পং নিয়ে বিশেষ কোনও পরিকল্পনা আছে কি?**

উত্তর- জিটিএ-র একটা আলাদা সংস্থা রয়েছে। তাদেরকে আলাদা ফান্ড দেওয়া হচ্ছে পাহাড় এলাকার উন্নতির জন্য। অনেকগুলো বোর্ডও গঠন করে দেওয়া হয়েছে তাদের উন্নতির সুবিধার্থে। তারপরও যদি তারা নতুন কোনও উন্নয়নের পরামর্শ দেয় বা কোনও আবেদন করে তবে তা খতিয়ে দেখা হবে। কারণ এর আগে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম জিটিএ এলাকাতে। তখন তারা মামলা করে সেটার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। তাই আমরা যেচে সেখানে কাজ করতে যাব না। যদি এমন হয় যে তারা কোনও কাজ করতে পারছে না, অথবা রাজ্য সরকারের সাহায্য চাইছে সেখানকার মানুষ তখন অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রী তা বিবেচনা করবেন। তবে পাহাড় ও ডুয়ার্স এলাকার টুরিজমের উপর আমাদের নজর থাকছে। দেশ বিদেশ থেকে টুরিস্ট যাতে সেখানে আসে সে বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যেই উদ্যোগী হয়েছি।

কালিম্পঙেও টুরিজম নিয়েই জোর দেওয়া হচ্ছে। লাভা-লোলেগাঁওতে প্রচুর মানুষ আসে। আমি নিজে ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান থাকাকালীন লাভা থেকে লোলেগাঁও ২৭ কিলোমিটার নষ্ট হয়ে যাওয়া পাকা রাস্তার কাজ শুরু করেছিলাম। কারণ যত বেশি মানুষ এখানে বেড়াতে আসবে তত স্থানীয় লোকের রোজগার বাড়বে। এখানকার হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প উন্নত হবে।

প্রশ্ন- **বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি সমাধান কীভাবে সম্ভব ভেবে দেখেছেন কি?**

উত্তর- অবশ্যই দেখছি। গত ৫ বছরে এটার উপর কাজ শুরু হয়েছে। তাই এবার দেখবেন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে যে হারে বৃষ্টি হয়েছে তাতে যতটা হবার কথা সেই অর্থে বন্যা হয়নি। পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হলে সেখান থেকে জল ছাড়লে তখন এখানে ওভার ফ্লো হয়। কিন্তু এবার আমরা বিভিন্ন এলাকায় নদী বাঁধ নির্মাণ করেছি, পুরনো নদী বাঁধের সংস্কার করেছি। তাতে কিন্তু এবছর নদী ভাঙন অনেকটা কম হয়েছে। আরও বেশ কিছু পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে, বর্ষার পর সেগুলোর কাজ শুরু করব। তবে এখানকার নদী ভাঙনের সমস্যা মিটবে এবং বন্যা মোকাবিলায় আমরা সক্ষম হব।

প্রশ্ন- **আপনার নিজের শহর কোচবিহারকে সাজিয়ে তুলতে নিশ্চয়ই নানাবিধ পরিকল্পনা আপনার মাথায় আছে! এই শহরের বর্তমান হতদরিদ্র চেহারা নিয়ে আপনি কতটা উদ্যোগি হতে পেরেছেন? রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা ছাড়াও রাজ আমলের বড় বড় দিঘিগুলির সংস্কার যে বহুদিন হচ্ছে না, সেটা খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে। কয়েকটি জলাশয়কে দেখে মনে হয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বুঁজিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। এসব নিয়ে আপনার পদক্ষেপ অদূর ভবিষ্যতে কতটা কঠোর হবে আশা করা যায়?**

উত্তর- আমি সাতটা জেলারই দায়িত্বে আছি। সেই সঙ্গে নিজের জেলাও অবশ্যই দেখি। এটা রাজার শহর, এখানে রাজ আমলের অনেক স্থাপত্য রয়েছে। বিশেষ করে রাজবাড়ি। সেখানে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড প্রদর্শনী করে তাকে আরও আকর্ষণীয় করার কথা ভাবা হচ্ছে। আবার অনেক স্থাপত্যেরই ভঙ্গুর দশা, যেমন সাবিত্রী লজ, গায়ত্রীদেবী সংগীত মহাবিদ্যালয়, আমতলার দিকে কিছু সরকারি বাংলো, দিনহাটার রাজপাট সহ বেশ কিছু পুরনো মন্দির রয়েছে। সেগুলো সংস্কার করা হবে।

আর দিঘির শহর কোচবিহার। বাম আমলে বহু দিঘি ভরাট করে বাড়ি করা হয়েছে। এখন যেসব দিঘিগুলো রয়েছে, সেগুলোকে সংস্কার করে সৌন্দর্যায়ন করে আকর্ষণীয় করে তুলতে চাইছি। এরপর আর কেউ যাতে কোনও পুকুর বা জলাশয় এক ফোঁটা বোজাতে না পারে তার জন্য কঠোর আইন প্রয়োগেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর মধ্যেই বৈরাগী দিঘি সৌন্দার্যায়নের টাকা দিয়ে দেবেন বলে পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেবের সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও নিকাশি ব্যবস্থার সমাধান করা হবে। রাস্তায় বর্তমান পথবাতির বদলে এলইডি লাইট দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে।

এক কথায় কোচবিহারকে আবার রাজ আমলের হারানো মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করা হবে। সব জেলার জন্য প্রচুর কাজ রয়েছে করার মতো। একবারে তা কখনই সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে তা করা হচ্ছে। কাজ সম্পূর্ণ হলে এক সময় উত্তরবঙ্গ শুধু রাজ্যে না, দেশের কাছে দৃষ্টান্ত হবে বলে আশা রাখছি।

'এখন ডুয়ার্স'-এর দপ্তরে বেশ কিছু চিঠি/মেল গত দু'মাসে এসেছে যেগুলি থেকে প্রথম দফায় বেশ কিছু প্রশ্ন বেছে নিয়ে মন্ত্রীর সামনে রাখা হয়েছিল। এবার পাঠকদের নাম-ঠিকানা আলাদা করে দেওয়া হল না ঠিকই কিন্তু আগামী সংখ্যা থেকে অবশ্যই প্রত্যেক প্রশ্নের সঙ্গে প্রেরকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অতএব নির্দ্বিধায় আপনার প্রশ্ন পাঠান, সঠিক পরিচয় দেবেন, চাইলে পরিচয় প্রকাশ করা হবে না।
প্রশ্ন পাঠান ই-মেলে
ekhonduars@yahoo.com

পাঠকদের প্রশ্নের উত্তরগুলি অনুলিখন করেছেন
আমাদের প্রতিনিধি **তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস**

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোচবিহারের যোগাযোগ ছিল রাজ পরিবারের বাইরেও

একটি বিস্মৃত প্রায় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় রাজনগর কোচবিহারে কখনও আসেননি। তাঁর কোচবিহারে না আসার পিছনে অনেকে অনেক যুক্তি খাড়া করেন, সেসব তর্কসাপেক্ষ। মোদ্দা কথা হল, কারণ যা-ই হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদধূলি থেকে বঞ্চিত হয়েছে কোচবিহারবাসী। যদিও কোচবিহারের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ সারাজীবন ছিল। রবীন্দ্রনাথ এবং কোচবিহার— শব্দ দুটো শুনলে প্রথমেই মনে ভেসে ওঠে একটাই নাম, তা হল মহারানি সুনীতিদেবী। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সখ্যর কথা বহুচর্চিত— বহু আলোচিতও। কিন্তু তিনি ছাড়াও কোচবিহারের বেশ কয়েকজন মানুষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা এখনও বহু লোক জানে না। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ইন্দিরা রায় (নারায়ণ)— কোচবিহারের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট।

আমাদের সাহিত্যজগতে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখার অভাব নেই। ভাবতে খারাপ লাগে, এত রবীন্দ্র-গবেষক, এত আলোচক, সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে দিস্তা দিস্তা লেখালেখি করে গিয়েছেন বা এখনও করছেন— তাঁরা কেউই ইন্দিরা রায়কে নিয়ে খুব একটা বেশি শব্দ খরচ করেননি। তেমনই অনেকেই জানেন না সুনীতিদেবীর স্বামী কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা। একাধিকবার কলকাতা ও দার্জিলিঙে কবিগুরু মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। সেই কোন কাল থেকে সুনীতিদেবীর বাবা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির সম্পর্ক। মাঝে ব্রাহ্মধর্ম নিয়ে একটু চাপানউতোর হলেও পরে সুনীতিদেবী ও তাঁর বোনদের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির সম্পর্ক খুব সুন্দর হয়ে যায়। কোচবিহার রাজবাড়িতে বিয়ে হয়ে আসার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুনীতিদেবীর সম্পর্ক নতুন মাত্রা পায়। পরবর্তীকালে সুনীতিদেবীর বড় মেয়ে সুকৃতিসুন্দরীর বিয়ে হয় রবীন্দ্রনাথের বড়দি স্বর্ণকুমারীদেবীর পুত্র জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের সঙ্গে। ফলে তাঁদের সম্পর্ক আত্মীয়তায় বদলে যায়। এসব ঘটনা বহুশ্রুত। কিন্তু আড়ালে থেকে গিয়েছেন আর-এক রবীন্দ্র-স্নেহধন্যা— ইন্দিরা রায়।

ইন্দিরা রায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ত্রিপুরা রাজপরিবারের সূত্র ধরে। একটু পিছনে ফেরা যাক। ত্রিপুরার রাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের পুত্র নবদ্বীপ মাণিক্য বাহাদুর রাজত্ব না নিয়ে তাঁর ভাইকে দিয়ে দেন। ইংরেজ অধিকৃত কুমিল্লা সেই সময় ত্রিপুরা রাজপরিবারের জমিদারির অংশ ছিল। সেখানকার চর্যাপ্রাসাদকে সংস্কার করে তিনি সংগীত ও শিল্পচর্চায় মেতে থাকতেন। নবদ্বীপ মাণিক্য বাহাদুর যেমন অসম্ভব সুন্দর বীণা বাজাতেন, তেমনই ধ্রুপদী সংগীত, ছবি আঁকা, মূর্তি তৈরিতেও সমান পারদর্শী ছিলেন। তাঁর নয় সন্তানের একজন হলেন মৃণালিনীদেবী। আর-একজন ভারতবিখ্যাত সুরকার ও গায়ক শচীন দেববর্মন। পরবর্তীকালে মৃণালিনীদেবীর সঙ্গে হরেন্দ্রনারায়ণের নাতি কুমিল্লার সিভিল সার্জেন ডা. কুমার ভবেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হয়। এঁদেরই তৃতীয় সন্তান ইন্দিরার জন্ম হয় ১৯০২ সালের ২৪ মে। পড়াশোনা কলকাতার ডায়সেশন স্কুলে শুরু হলেও পরে চট্টগ্রামে ভরতি হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় জেলার প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে ডিভিশনাল স্কলারশিপ অর্জন করেন। এর পর আবার কলকাতা। ১৯২২ সালে কলকাতার ডায়সেশন কলেজে ভরতি হন তিনি। ১৯২৪ সালে প্রথম বিভাগেই

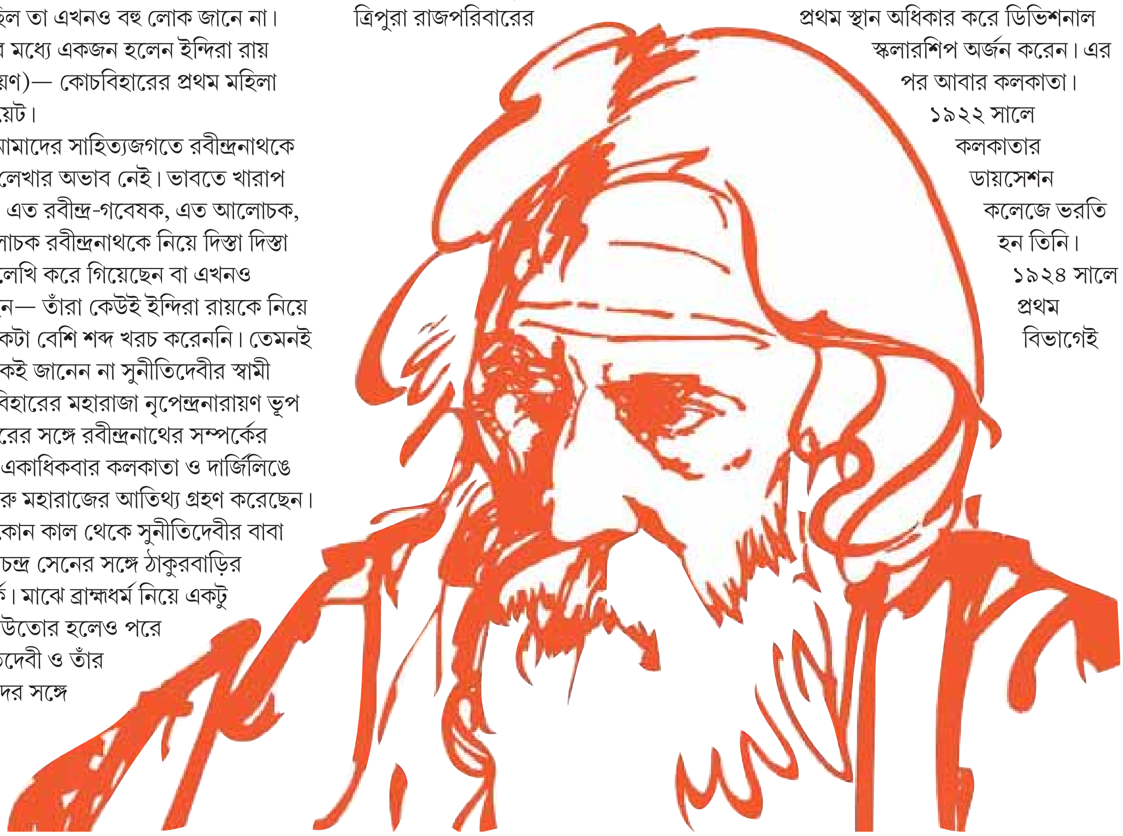

আই এ পাশ করেন। ১৯২৬ সালে বি এ। ততদিন ইন্দিরার পরিবার কোচবিহারে চলে এসেছে। পড়াশোনার পাট চুকিয়ে ইন্দিরাও চলে আসেন কোচবিহারে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭ সালে স্থানীয় ল্যান্সডাউন হলে জেলার প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট হিসেবে কোচবিহারের নাগরিকদের পক্ষ থেকে ইন্দিরাকে একটি সোনার ঝালর দেওয়া মানপত্র দিয়ে সম্মান জানানো হয়। কলকাতায় থাকাকালীন ১৯২২ সাল থেকেই শান্তিনিকেতনে তাঁর যাতায়াত শুরু। রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসা তখন থেকেই। যদিও দাদু নবদ্বীপ মাণিক্য বাহাদুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা সম্পর্ক ছিল, তাই কুমিল্লায় থাকাকালীন ছোট্টবেলায় রবীন্দ্রনাথকে কাছ থেকে দেখাও অসম্ভব নয় বলে অনুমান। যা-ই হোক, কলেজে ভরতি হবার পর থেকেই ইন্দিরা শান্তিনিকেতনে যাতায়াত শুরু করায় সেই যোগাযোগ আরও গভীর হয়। সে সময় কোচবিহারের মহারাজা ছিলেন জিতেন্দ্রনারায়ণ। তাঁর স্ত্রী গায়কোয়াড়ের রাজকন্যা মহারানি ইন্দিরাদেবী ১৫ মে ১৯২৬ সালে ইন্দিরাকে তাঁর 'লেডি কম্প্যানিয়ন' পদ দিয়ে সম্মানিত করেন। এর পর মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের এডিসি পূর্ণানন্দ রায়ের সঙ্গে ১৯২৭ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন ইন্দিরা। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠার কারণে প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি সংগীত ও চিত্রকলাতেও প্রতিভা ছিল তাঁর। শিক্ষিত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই নারী খুব সহজেই মহারানি ইন্দিরাদেবী এবং তাঁর সন্তানদের প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠেন। মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ ও মহারানি ইন্দিরাদেবীর তিন কন্যা— ইলা, গায়ত্রী ও মেনকার খুব কাছের ইন্দুপিসিকে লেখা বহু চিঠি এর স্বাক্ষর বহন করছে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত জিতেন্দ্রনারায়ণ ভাল বাংলা না বলতে পারার জন্য যে খুব লজ্জা পেতেন, তার উল্লেখ আমরা বিভিন্ন জায়গায় পাই। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর সন্তানরা যেন ভাল বাংলা শেখে। সেই উদ্দেশ্যে ১৯৩৪ সালে কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে তাঁর তিন মেয়েকে পাঠানো হয়। অভিভাবিকা হিসেবে যান ইন্দিরা রায়। যদিও শান্তিনিকেতনে রাজকন্যারা খুব বেশি দিন থাকেনি। ইলা মাস ছয়েক, গায়ত্রী ও মেনকা বছরখানেক মতো ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা পড়া ও লেখা তারা রপ্ত করতে পেরেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সে সময় শান্তিনিকেতনে আরও এক ইন্দিরা আবাসিক হয়ে ছিলেন। তিনি ইন্দিরা নেহরু— ভারতের ভাবী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। কোচবিহারের রাজকন্যারা শান্তিনিকেতন থেকে চলে এলেও ইন্দিরা রায় প্রায় আড়াই বছর রবীন্দ্রনাথের

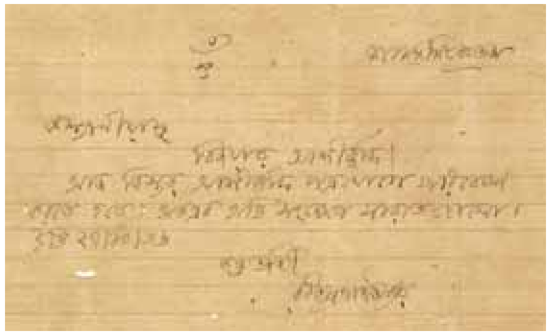

স্নেহচ্ছায়ায় সেখানে কাটান। শান্তিনিকেতনে সংগীত ও চিত্রকলায় বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন তিনি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এই সময়। কিছুদিন নন্দলাল বসুর কাছে ছবি আঁকাও শিখেছিলেন, তবে প্রথাগতভাবে নয়। সে সময় শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইন্দিরা অংশগ্রহণ করতেন। ক্রমে তিনি সেখানে প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠেন সবার। শান্তিনিকেতনে সংগীতমহলে ইন্দিরা যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন, তার প্রমাণ আমরা পাই ১৯৩৬-এ সিংহ সদনে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র পরিচয় সভার গীতোৎসবে। সেখানে শান্তিদেব ঘোষ-সহ তাবড় তাবড় সংগীত প্রতিভার সঙ্গে যুগ্ম ও এককভাবে গান গেয়েছিলেন ইন্দিরা রায়। (নিচের ছবিতে এর প্রমাণ রয়েছে) (সিংহ সদনের অনুষ্ঠানের ছবি)

শান্তিনিকেতন ছেড়ে আসার পরও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইন্দিরার যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল, কবিগুরুর লেখা চিঠিগুলি এর সাক্ষ্য বহন করে। ২৭/১০/১৯৩৬-এ বিজয়ার আশীর্বাদ জানিয়ে লেখা এই ছোট্ট চিঠি—

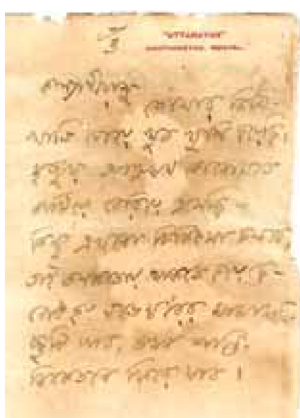

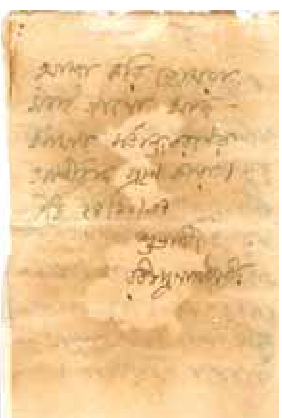

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ

আজ বিস্তর আশীর্ব্বাদ পত্রযোগে পরিবেষণ করতে হবে। অতএব অতি সংক্ষেপে সারতে হল।

ইতি

২৭/১০/৩৬শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আরেকটি চিঠিতে তিনি ইন্দিরাকে লিখেছেন তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা। জ্যৈষ্ঠ মাসে শান্তিনিকেতনে থাকতে চান না, শিলং অথবা পুরী যাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। চিঠিতে বুড়ির বিয়ের উল্লেখ রয়েছে। সঙ্গে আছে বিয়েতে ইন্দিরাকে আসবার কথাও। এই বুড়ি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নাতনি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কন্যা মীরাদেবীর মেয়ে নন্দিতা। এর সঙ্গে কবিগুরুর অত্যন্ত স্নেহভাজন কৃষ্ণ কৃপালনির বিয়ে হয় ২৫ এপ্রিল ১৯৩৭ সালে। কোচবিহার থেকে এই বিবাহে যোগ দিতে সপরিবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন ইন্দিরা রায়। ২৪/১০/১৯৩৭-এ লেখা আরেকটি চিঠি— ইন্দিরা রায়ের চিঠির প্রত্যুত্তরে কলকাতা থেকে লেখা। সে সময় রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, ডাক্তারের কড়া প্রহরায় থাকার কথাও ওই চিঠি থেকে জানা যায়।

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। মৃত্যুর আক্রমণ কোনোমতে কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছি— কিন্তু এখনো চিকিৎসা চলবে, তাই কলকাতায় থাকতে হয়েছে— বোধহয় নভেম্বরের মাঝামাঝি ছুটি পাব। তখন শান্তিনিকেতনে ফিরে যাব। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছ। আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

ইতি

২৪/১০/৩৭

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এগুলো ছাড়াও আরও নানা চিঠিতে ছড়িয়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইন্দিরার আন্তরিক সম্পর্কের কথা। শুধু রবীন্দ্রনাথই নন, কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী অর্থাৎ পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীর সঙ্গেও খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। ২৭/০৯/৪২-এ লেখা প্রতিমাদেবীর এই চিঠিটা পড়লে বোঝা যায় যে, তাঁদের মধ্যে চিঠির আদানপ্রদান হত,

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরও তা অব্যাহত ছিল। এই চিঠি থেকে জানা যায়, সে সময় স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে দেশ উত্তাল। তার আভাস আমরা এখানে দেখি। নন্দিতা অর্থাৎ

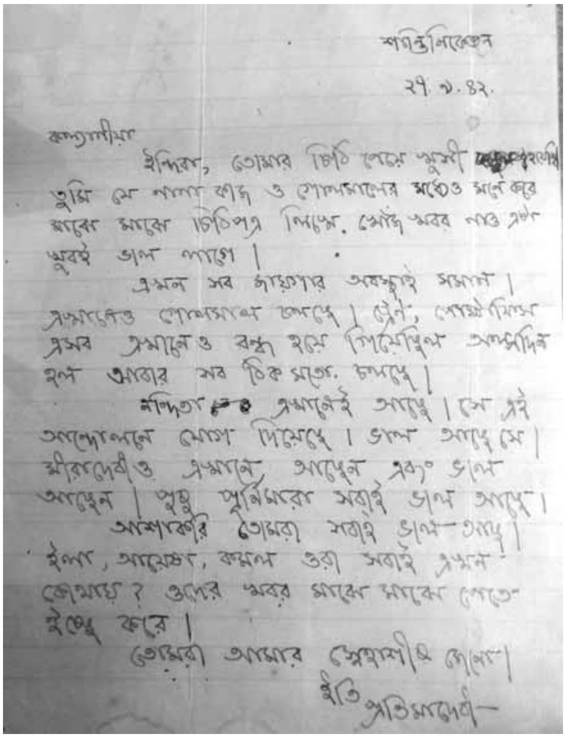

শান্তিনিকেতন
২৭.৯.৪২.

কল্যাণীয়া
ইন্দিরা, তোমার চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি
তুমি যে নানা কাজ ও গোলমালের মধ্যেও মনে করে
মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখছ, খোঁজ খবর নাও এটা
খুবই ভাল লাগে।
এখন সব জায়গার অবস্থাই সমান।
এখানেও গোলমাল চলছে। ট্রেন, পোস্ট অফিস
এসব এখানেও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অল্পদিন
হল আবার সব ঠিক মত চলছে।
নন্দিতা ও এখানেই আছে। সে এই
আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। ভাল আছে সে।
মীরাদেবীও এখানে আছেন এবং ভাল
আছেন। পুতু পূর্ণিমারা সবাই ভাল আছে।
আশাকরি তোমরা সবাই ভাল আছ।
ইলা, আয়েষা, কমল ওরা সবাই এখন
কোথায়? ওদের খবর মাঝে মাঝে পেতে
ইচ্ছে করে।
তোমরা আমার স্নেহাশীষ জেনো।
ইতি
প্রতিমাদেবী—

বুড়ি এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে একসময় এলেও কোচবিহার রাজপরিবারের কাছে মানুষ হবার কারণে ইন্দিরা ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ আন্দোলনে যোগ দিতে পারেননি। চিঠিতে ইলা, আয়েষা অর্থাৎ গায়ত্রীদেবীর কথা জানতে চেয়েছেন প্রতিমাদেবী। এ ছাড়াও চিঠিতে পূর্ণিমা, কমল ইত্যাদি যাঁদের উল্লেখ পাই, তাঁরা সকলেই ছিলেন ইন্দিরার আত্মীয়।

প্রতিমাদেবীর এই চিঠি পড়লেই রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে কোচবিহার রাজপরিবার ও ইন্দিরা রায়ের আন্তরিক সম্পর্কের কথা বোঝা যায়।

এ ছাড়াও শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন আরও অনেকের সঙ্গেই যে ইন্দিরার সুসম্পর্ক ছিল তা আমরা দেখতে পাই প্রখ্যাত গায়ক শান্তিদেব ঘোষের লেখা একটি চিরকুটে। ১৯৫৯ সালে একবার কোচবিহারে এসেছিলেন শান্তিদেব ঘোষ। তিনি লিখেছেন, 'আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে শান্তিনিকেতনের অনেক পুরনো আনন্দের স্মৃতি মনে এল।' শান্তিদেব ঘোষ ১৬/০৫/৫৯। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শান্তিদেব ঘোষের সঙ্গেও কোচবিহারের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তাঁর পিতা কালীমোহন ঘোষ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজের (তৎকালীন ভিক্টোরিয়া কলেজ) ছাত্র ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে বাধ্য হয়েই তিনি কোচবিহার ছেড়ে চলে যান। আশ্রয় পান রবীন্দ্রনাথের কাছে। শান্তিদেব ঘোষ এবং সাহিত্যিক সাগরময় ঘোষ তাঁরই দুই সন্তান। এঁরা ছাড়াও কোচবিহারের দেওয়ান কালিকাদাস দত্তর পুত্র চারুচন্দ্র দত্ত, যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর পৌত্র কবি অমিয় চক্রবর্তী—সকলেই রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত কাছের মানুষ

সুনীতি দেবীর সঙ্গে ইন্দিরা রায় ও তাঁর দুই বোনঝি

ছিলেন, যাঁদের সকলেরই শেকড় কোচবিহারে।

আর-একজনের কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন নিরুপমাদেবী। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও মহারানি সুনীতিদেবীর সন্তান কুমার ভিক্টর নিতেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী। তিনিও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের খুবই স্নেহের পাত্রী। কোচবিহার থেকে সম্পাদিত তাঁর 'পরিচারিকা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন। বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি নিরুপমাদেবীর। বিবাহবিচ্ছেদের পর তিনি শান্তিনিকেতনে চলে যান। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে শিশির সেনের সঙ্গে নিরুপমাদেবীর বিবাহ হয়।

তাই রবীন্দ্রনাথ শুধু সুনীতিদেবী নন, কোচবিহারের আরও অনেক মানুষের সঙ্গে নানা সূত্রে যুক্ত ছিলেন। সেই যোগসূত্রগুলো

বিয়ের আগে ইন্দিরা কুমিল্লায় মামার বাড়ির বাগানে

নিয়ে ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকায় দু'-একবার লেখা হলেও তেমনভাবে পাঠকের নজরে আসেনি। রবীন্দ্রনাথ নিজে চিঠি লিখতে ও উত্তর পেতে ভীষণ ভালবাসতেন। সারাজীবনে প্রচুর ভাললাগার মানুষকে চিঠি লিখেছিলেন। সেসব চিঠিপত্রের খোঁজ মেলা আজ দুরূহ। ইন্দিরা রায়কে তিনি আরও বেশ কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে তা আজ হারিয়ে গিয়েছে। তবে যতটুকু রক্ষা করা গিয়েছে তা অমূল্য— সাধারণের কাছে তো বটেই, রবীন্দ্র-গবেষকদের কাছেও। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতে একবার কোচবিহারে নিজের বাসভবনে একক উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করেছিলেন ইন্দিরা রায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, কোচবিহারে আসার জন্য বহুবার তিনি রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। কোনও এক অজানা কারণে কোচবিহারে কখনও আসেননি তিনি। কিন্তু না এলেও এখানকার সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ তাঁরা সারাজীবন ছিল। তবে এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলা হল, তাঁরা কোচবিহারে হলেও এখানে থাকতেন না। তাঁদের প্রায় কেউই আর কখনও কোচবিহারে ফিরেও আসেননি। একমাত্র ইন্দিরা রায়ই সারাজীবন থেকেছেন কোচবিহারে। ১০ জুলাই ১৯৭৮-এ সিলভার জুবিলি রোড (স্মিথ রোড)-এর তাঁর নিজস্ব বাসভবনে ইন্দিরা রায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেষ যোগসূত্রটির অবসান ঘটে।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

ঋণস্বীকার- আশিস কুমার রায়, স্বপন রায় ও নির্মলেন্দু চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ নিজে চিঠি লিখতে ও উত্তর পেতে ভীষণ ভালবাসতেন। সারাজীবনে প্রচুর ভাললাগার মানুষকে চিঠি লিখেছিলেন। সেসব চিঠিপত্রের খোঁজ মেলা আজ দুরূহ। ইন্দিরা রায়কে তিনি আরও বেশ কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে তা আজ হারিয়ে গিয়েছে। তবে যতটুকু রক্ষা করা গিয়েছে তা অমূল্য।

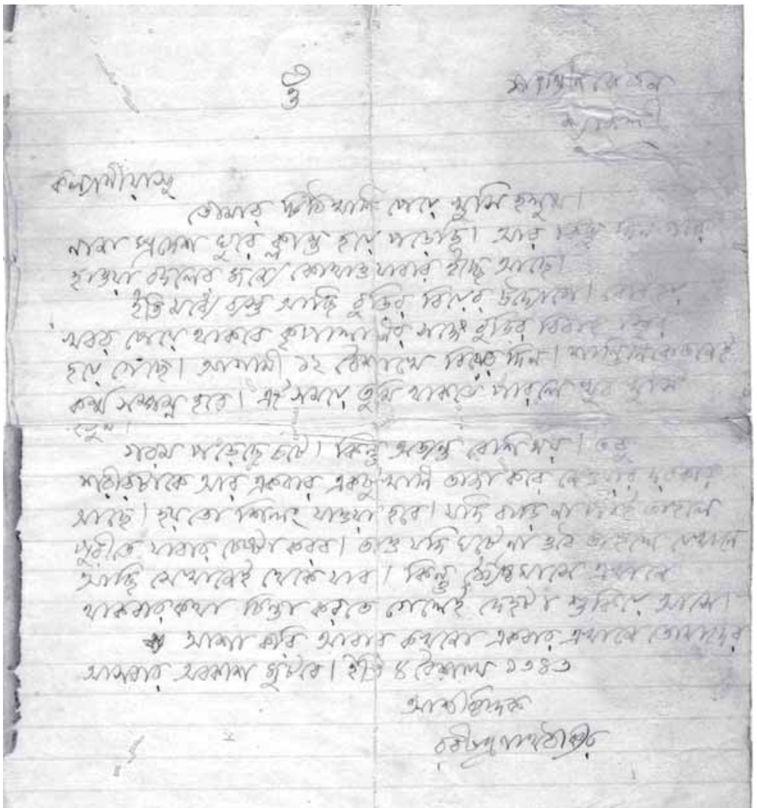

শান্তিনিকেতন
শ্যামলী

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। নানা প্রদেশ ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর কিছু দিন পরে হাওয়া বদলের জন্যে কোথাও যাবার ইচ্ছে আছে।

ইতিমধ্যে ব্যস্ত আছি বুড়ির বিয়ের উদ্যোগে। বোধহয় খবর পেয়ে থাকবে কৃপালনির সঙ্গে বুড়ির বিবাহ স্থির হয়ে গেছে। আগামী ১২ বৈশাখে বিয়ের দিন। শান্তিনিকেতনেই কর্ম্ম সম্পন্ন হবে। এই সময়ে তুমি থাকতে পারলে খুব খুসি হতুম।

গরম পড়েছে বটে। কিন্তু অত্যন্ত বেশি নয়। তবু শরীরটাকে অর একবার একটুখানি তাজা করে নেওয়ার দরকার আছে। হয়তো শিলং যাওয়া হবে। যদি বাড়ি না পাই তাহলে পুরীতে যাবার চেষ্টা করব। তাও যদি ঘটে না ওঠে তাহলে যেখানে আছি সেখানেই থেকে যাব। কিন্তু জ্যৈষ্ঠমাসে এখানে থাকবার কথা চিন্তা করতে গেলে দেহটা শুকিয়ে আসে।

আশা করি আবার কখনও একবার এখানে তোমাদের আসবার অবকাশ জুটবে। ইতি ৪ বৈশাখ ১৩৪৩

আশীর্ব্বাদক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ডুয়ার্সের মাটিতে মাশরুম বিপ্লব চান দিব্যেন্দুকান্তি

কিছু কিছু মানুষ এখনও আছেন, যাঁরা গতানুগতিক রাস্তায় না হেঁটে একটু আলাদাভাবে বাঁচতে চান। এঁরা যেন দলে থেকেও দলের বাইরে। ভাগ্যের জোরে নয়, ভাগ্যকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে জয়ী হন জীবনযুদ্ধে। এমনই একজন মানুষ জলপাইগুড়ির দিব্যেন্দুকান্তি মজুমদার। প্রথাগত কর্মজীবনের বাইরে থেকেই যিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে গড়ে তুলেছেন তাঁর সাম্রাজ্য, যাঁর ছত্রছায়ায় শ্বাস নেন আরও কয়েক হাজার মানুষ।

জন্মসূত্রে কার্শিয়াঙের বাসিন্দা হলেও উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় থাকতেন একটা সময়। উদ্ভিদবিদ্যায় স্নাতকোত্তর প্রেসিডেন্সির এই প্রাক্তনী সহজেই পেয়ে যেতেন সরকারি মোটা মাইনের কোনও চাকরি। কিন্তু তিনি যে ভিড়ে থেকেও স্বতন্ত্র তা প্রমাণিত। পছন্দের বিষয় 'টিস্যু কালচার' নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন, টিস্যু কালচারে যে দ্রবণটি ব্যবহৃত হয়, সেটি অত্যন্ত দামি। তাই কম খরচে কীভাবে এটা করা যায়, তার ভাবনাচিন্তা চলছিলই। ভাবছিলেন, কম খরচে উৎপাদিত হয় এমন কোনও বীজ যদি পাওয়া যায় এবং তা যদি সাধারণ মানুষ বা

বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষের নাগালের মধ্যে হয়, তবে সেই বীজ উৎপাদন করে খুব সহজেই চাষ করা যেতে পারে। জানা গেল, মাশরুম বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে টিস্যু কালচারের খরচ খুব কম। তাই সাধারণের কথা অথবা বলা ভাল, গ্রামাঞ্চলের মানুষের কথা ভেবে মাশরুমকেই বেছে নিলেন তিনি। এর পরই মেদিনীপুর, নদিয়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামবাসীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে এক অভিনব চিন্তা করলেন। মাশরুম বীজ উৎপাদন, চাষ ও বিক্রি। কিন্তু হঠাৎ দক্ষিণবঙ্গই বা কেন? জলপাইগুড়ি বা ডুয়ার্সের অন্য কোথাও কি শুরু করা যেত না? 'কলকাতায় বসবাস করার সূত্রে ওখান থেকে আসার কথা ভাবাই হয়নি আগে। সুন্দরবনে মধু চাষ দেখে মন হত, মাশরুমকেও যদি এভাবে করা যায়, কেমন হয়? তখনই ওখানকার বিভিন্ন এনজিও বা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজের সুযোগ হয়।' মাশরুমের মতো অপ্রচলিত একটা খাবারকে নিয়ে শুরু করলেন পরীক্ষানিরীক্ষা। বেশ কিছু টেকনিক্যাল সমস্যার সম্মুখীন হন তখন। দরকার ছিল সঠিক দিশার। সমাধানও পেয়ে গেলেন। পুন্ডীবাড়ি, কোচবিহারের বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ট্রপিক্যাল মাশরুম প্রজেক্ট'-এ যুক্ত হলেন তিন বছরের জন্য। এত কিছু থাকতে মাশরুমই বা কেন? 'প্রথমত, এই চাষে পোয়াল এবং মাশরুম বীজ ছাড়া আর তেমন কোনও কাঁচামাল লাগে না। গ্রামাঞ্চলে যা সহজলভ্য। কম পুঁজিতে যথেষ্ট লাভজনক। যদিও এর চাষ খুবই স্পর্শকাতর।'— জানালেন তিনি। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল জলবায়ু, যা এই মাশরুম চাষের পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত। বরং ইউরোপিয়ান ঠান্ডা দেশগুলো এই মাশরুম চাষের জন্য একেবারে উপযুক্ত। এইরকম প্রতিকূল পরিবেশে মাশরুম চাষ করানোটাই ছিল তাঁর গবেষণার মূল বিষয়। তাই ১৯৯৫ সালে নিজের জায়গায় ফিরে এই মাশরুম চাষ নিয়ে আবার কাজ শুরু করলেন। বন দপ্তরের সঙ্গে মিলিতভাবে শুরু হল 'ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক প্রজেক্ট'। দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে সেই প্রথম শুরু হল মাশরুম চাষ। শূন্য থেকে শুরু হল এই যাত্রা। বন সংলগ্ন কয়েকটি গ্রামকে চিহ্নিত করে গ্রামবাসীদের রোজগারের পথ দেখানোই ছিল তাঁর মূল কাজ। সহজ ছিল কি এই কাজ? 'না, বাধা এসেছে প্রচুর। প্রায় অশিক্ষিত মানুষগুলোকে নতুন কারিগরি বিদ্যায় এই চাষে আগ্রহী করে তোলা ছিল ধৈর্যসাপেক্ষ।' আদৌ মাশরুমের মতো একটা খাবার বিক্রি হবে কি না বা বিক্রি হলেও তা কতটা— এসব প্রশ্ন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল তাঁকে। কালিম্পঙে থাকাকালীন প্যাকেটিং

করে অফিসে অফিসে মাশরুমের বাজার ধরার চেষ্টা করেন তিনি। প্রথম দিনই অভাবনীয় সাড়া মিলেছিল। বুঝে গিয়েছিলেন, যা চাইছেন তা হয়ত এখানেই পেয়ে যাবেন। ১৯৯৭ সালে রন্তিতে নিজের উদ্যোগে হ্যান্ডবিল বিলির মাধ্যমে মাশরুম বিক্রি শুরু করলেন। অপুষ্টিতে ভোগা মানুষগুলোকে এই মাশরুমের পুষ্টিগুণ বোঝানো, বিক্রি— সবটাই করেছেন নিজের হাতে। ক্রমে এই মাশরুম স্বগুণে বিখ্যাত হয় 'রন্তিকা চেও' নামে, যার বৈজ্ঞানিক নাম হল 'Pleurotus'। উৎপাদন বাড়তে বাড়তে একসময় জলপাইগুড়ি হয়ে ওঠে মাশরুম চাষের 'নিউক্লিয়াস'। মূলত সকালের বাজারটাই ধরার চেষ্টা করলেন তিনি। ভেবে দেখলেন, খবরের কাগজ ও দুধ— এই দুইয়েরই বিক্রি সকালে, সুতরাং মাশরুমকেও সকালের মধ্যেই বাজারে পৌঁছে দিতে হবে। সেই শুরু... আজও খবরের কাগজের গাড়িতেই মাশরুম পৌঁছে যায় ডুয়ার্স ও অন্য পাহাড়ি এলাকাগুলিতে। হু হু করে বিক্রি হয়ে যায় প্রায় সমস্ত প্যাকেট। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উৎপাদন বাড়লেও লক্ষ্যপূরণ এখনও অধরা। 'বর্তমানে আমাদের মাশরুম উৎপাদন দৈনিক ৩,০০০ কেজি হলেও চাহিদা রয়েছে ৫,০০০ কেজির।' জোরকদমে চলছে উৎপাদন বাড়ানোর কাজ। এই সময়ই ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলো পরপর বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। চা শ্রমিকদের দুরবস্থা ও পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক দিক একেবারে বসে যাওয়া দেখে চা শ্রমিকদের বিকল্প রাস্তা দেখানোর কথা মাথায় আসে। এর পর পলিটেকনিক কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে তিনি কাজ আরম্ভ করেন। চায়ের বদল হিসেবে মাশরুমকে তুলে আনাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্যে। বর্তমানে ডুয়ার্সের প্রায় ৪,৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই চাষের সঙ্গে যুক্ত, যা নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়। বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরি করার ক্ষেত্রেও তিনি ছুঁলেন সফলতার শিখর। সমগ্র পূর্ব ভারতে তিনিই প্রথম এর উৎপাদন শুরু করেন, যা

২০১৬-তে দাঁড়িয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে নিয়েছে। সবাই কি এই মাশরুমকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে? 'অনেকেই করেছে। তবে বাঙালি ও মাড়োয়ারিদের মধ্যে এখনও সেভাবে এটি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি।' কথায় কথায় জানতে পারা গেল, যেহেতু বীজ ছড়ানোর পর প্রায় ২৫ দিন লাগে মাশরুম হতে, তাই সারা বছরই বীজ ছড়ানোর কাজ চলতে থাকে, যাতে ৩৬৫ দিনই মাশরুম বাজারে মেলে। তবে পাহাড়ি এলাকায় ধরেই নেওয়া হয়, ২৫-৩০ দিন এর বিক্রি বন্ধই থাকবে। বিভিন্নরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন পাহাড়ে ধস তার অন্যতম কারণ। গ্রামীণ অর্থনৈতিক বিকাশে সচেতনতার অভাব ও সরকারি সাহায্য সেভাবে না মিললেও তিনি প্রায় একক প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছেন মোহিতনগরে 'মাশরুম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার', যেখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে দেশ-বিদেশের উৎসাহীদের। সেখান থেকেই তৈরি হচ্ছে বীজ, যা পৌঁছে যাচ্ছে ডুয়ার্সসহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের যেখানে যেখানে মাশরুম চাষ হয়, সেইসব অঞ্চলে। মাশরুমের কি সেভাবে খাদ্যগুণ আছে? 'অবশ্যই। এটি অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিটিউমার, ক্যানসার রিসার্চ সেন্টারের 'পয়জন' শোষণকারী হিসেবে এবং এইডস নিয়েও বিভিন্ন কাজে একে লাগানো হচ্ছে, যার ফল সুদূরপ্রসারী।' বর্তমানে ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গা তো বটেই, আসামের করিমগঞ্জ থেকে শুরু করে কাঠমান্ডু, ত্রিপুরা অথবা মালদা— সব জায়গাতেই তাঁর তত্ত্বাবধানে চলছে মাশরুম চাষ ও বিক্রি। এর মাধ্যমেই বহু বেকার যুবক খুঁজে পেয়েছে রোজগারের উপায়। দক্ষিণবঙ্গ ছেড়ে পাকাপাকিভাবে চলে এলেও এখনও নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন অতীতের সেইসব মানুষের সঙ্গে, যারা এই চাষের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষভাবে সহায়ক। সুবিধা-অসুবিধায় তারাও দিব্যেন্দুবাবুর মতামত নিতে ভোলে না। এইভাবেই ভারতের একটা অংশে, বিশেষ করে পূর্ব ভারতের এক বিপুল কর্মকাণ্ডের কান্ডারি হয়ে ওঠেন তিনি। চা শিল্পকে কয়েক গুণ ছাপিয়ে যাওয়াই একমাত্র লক্ষ্য এই বিজ্ঞানীর। তাঁর চোখে জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠছিল অহংকার, দেশের ও দশের জন্য কিছু করার তীব্র তাগিদ। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠছেন দৃষ্টান্ত। দিব্যেন্দুবাবুর দৃঢ় মনোভাব দেখে আমরাও জোর গলায় বলতে পারি, ডুয়ার্সের চা শিল্পে চূড়ান্ত অবনতির পর একমাত্র মাশরুমই পারে সেই ফাঁকা জায়গা পূরণ করতে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

সাক্ষাৎকার- **সুব্রত বসু**

অনুলিখন- **শাঁওলি দে**

খুদে ক্রিকেটারদের কোচিং ক্যাম্প

১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত সিএবি ডিস্ট্রিক্ট ইউনিফর্ম কোচিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হল জলপাইগুড়ি জেলাতে। শহরের বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত এই শিবিরটিতে অংশ নিয়েছিল অনূর্ধ্ব-১৪ এবং অনূর্ধ্ব-১৬ বছরের ক্রিকেটাররা। ক্যাম্পটিতে ছেলেদের প্রশিক্ষণ দিলেন সিএবি-র হেড কোচ প্রেমাংশু দাস। সহকারী কোচ ছিলেন পার্থ মণ্ডল ও উদয় রায়।

শুরু হল তুফানগঞ্জ মহকুমা ফুটবল লিগ

গত ১৫ জুলাই কোচবিহারের তুফানগঞ্জে শুরু হয়েছে তুফানগঞ্জ মহকুমা ফুটবল লিগ ২০১৬। অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন বিধায়ক ফজল করিম মিঞা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার শিবশংকর পাল। তাঁকে পেয়ে ক্রীড়াপ্রেমীদের উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পৌরপতি অনন্ত বর্মা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জগদীশ বর্মন, কোচবিহার জেলা সভাধিপতি পুষ্পিতা রায় ডাকুয়া-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি। তুফানগঞ্জ ক্রীড়া সংস্থার মাঠে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের ঘরের ছেলে শিবশংকর পালকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক চাঁদমোহন সাহা জানান, এই ফুটবল লিগে মোট ১৬টি টিম অংশগ্রহণ করেছে। তাদের ৪টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম দিনের খেলা হয় শালমারী যুব সংঘের সঙ্গে স্পোর্টিং অ্যাকাডেমির। সব ক'টি দলের সঙ্গে মোট ৩৯টি খেলা হবে বলে জানান তিনি। এতে সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাওয়া চারটি টিমের মধ্যে খেলা থেকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হবে। বৃষ্টির কারণে মাঝে খেলা চালানো সম্ভব হয়নি। ২৩ তারিখ থেকে আবার খেলা শুরু হয়েছে বলে জানান চাঁদমোহনবাবু।

নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রহেলিকার ডুয়ার্স

১

পটলরাম পর্যটককে নিয়ে আর পারা যায় না। গবেষণা করবে বলে সেই যে হাওয়া হয়েছে, আর পাত্তাই নেই। শেষে সে দিন দেখি বিন্দুর জঙ্গলে একা একা ধ্যান করছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' উত্তরে সে পাখির ঠ্যাঙের মতো চোখ তুলে ইশারায় একটা পাইপ দেখাল। তারপর বলল, 'সে বাড়ির আগাগোড়া নিলে নল আসে জীবনে আমার।' বুঝলাম ব্যাটার নিউরোন ঢিলে হয়েছে। তবে কোথায় ছিল, সেটা কিন্তু ঠিকই বলেছে। আপনারা তো জানেনেই। তা-ই না?

২

একবার পটলরাম 'নেত্য বাংলা রিয়্যালিটি শো'-এ বিচারক হয়ে গিয়েছিল। সেখানে বিশ্ববিখ্যাত ডান্স মাস্টার কাকা পাওয়ার হাজির ছিলেন। পটলরাম তাঁকে শুধিয়েছিল, 'আচ্ছা, বলুন তো! মেয়ে বেড়ালের সঙ্গে চেরাপুঞ্জির মাথা যুক্ত করলে কোন নৃত্যর কথা মনে হয়?' কাকা পাওয়ার উত্তর না খুঁজে পেয়ে আর 'নেত্য বাংলায়' ফিরে আসেননি। কী ছিল সেই নাচ? ডুয়ার্সের তো বটেই। কিন্তু কী?

৩

সিতাসিতের লড়াই নাই
তামা ঘষে সোনা পাই
ইচ্ছা হলেই ভেজে খাই।
বাপ রে! এ আবার কী? প্লিজ সাহায্য!

গতবারের উত্তর— ১) মদনমোহন
২) শীতলকুচি

ব্যাসকূট বসু

উত্তর পাঠান ই-মেল বা ডাক মারফত। সঠিক উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ছাপা হবে আগামী সংখ্যায়। সেই সঙ্গে নতুন ধাঁধা পাঠাতে পারেন আপনিও। তবে তা অবশ্যই ডুয়ার্স সম্পর্কিত হতে হবে।

চোরাচালান অবাধেই ঃ হিলি আছে হিলিতেই

হিলি। ছোট্ট একটু জায়গা। শহর তো নয়, গঞ্জই বলা যায়। কিন্তু হিলিকে চেনে সবাই। কারণ? বিখ্যাত সীমান্ত এলাকা। হিলি সীমান্ত যেমন পণ্য রপ্তানির জন্য প্রসিদ্ধ, তেমনই চোরাচালানেও কুখ্যাতি আছে তার। শোনা যায়, হিলির অনেক বাড়ির সামনেই মুদিখানার দোকান আর পিছনে চোরাচালানের কেন্দ্রস্থল। তা-ই বলে কি উন্নয়নের পরিকল্পনা হয় না হিলিকে ঘিরে? এই তো কিছুদিন আগে মন্ত্রী থাকাকালীন শংকর চক্রবর্তী ওয়াগা বর্ডারের আদলে হিলি সীমান্তকে গড়ে তুলতে পরিকল্পনা জমা দিয়েছিলেন। এই তো কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদল হিলিকে আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর করার পরিকল্পনায় আরেকবার পরিদর্শন করে গেল। তা হঠাৎ হিলি সীমান্ত প্রতিবেদনের বিষয় কেন? কারণ সাম্প্রতিক বাংলাদেশের গুলশান হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। তারপর নাকি সীমান্ত আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। সত্যিই কি তা-ই?

গুলশান এবং পরবর্তী

১ জুলাই ঢাকার গুলশানের রক্তাক্ত ছবি এখন ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। কী নৃশংস। মানবতাবাদের উপর এক ভয়ংকর আক্রমণ। আর তারপরেই ভারতের হিলি সীমান্তে জোরদার করা হল নিরাপত্তা, নজরদারি। যারা বৈধ পাসপোর্ট নিয়েও এ দেশে আসছে হিলি সীমান্ত দিয়ে, তাদেরও দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখা হচ্ছে— এমনটাই অভিযোগ। সীমান্তে বিএসএফ টহল বাড়ানো হল। তাহলে কি এতদিন ঢিলেঢালা ছিল সব?

ঢিলেঢালাই তো!

এমনটাই বলছেন হিলির স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, তা না হলে দিনেরবেলাতেও দক্ষিণপাড়া, উজাল, জামালপুর সীমান্ত রুট কী করে ব্যবহার করছে পাচারকারীরা? উজাল, জামালপুর দিয়ে প্রতিরাত্রে গোরুসহ অন্যান্য সামগ্রী পাচার চলছে কীভাবে? সীমান্তের বহু বাড়িকে টাকার বিনিময়ে পাচারকারীরা অবৈধ জিনিসপত্র রাখার গুদামে পরিণত করেছে। বালুরঘাট শহর থেকে বিভিন্নভাবে চোরাই পথে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ফেনসিডিল-সহ বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী হিলিতে এনে তারপর ধীরে ধীরে হিলি

সীমান্তের অন্য জায়গাতে ছড়িয়ে দেয়। আর সবটাই চলে বিএসএফের চোখের আড়ালে! রাতের অন্ধকারে!

তাহলে কি দিনেও?

হিলি চেকপোস্ট থেকে ঢিল-ছোড়া দূরত্বে দক্ষিণপাড়া। দক্ষিণপাড়ার পাশ দিয়েই গিয়েছে বাংলাদেশের রেলপথ। এখানে প্রায় ১ কিলোমিটার জায়গা কাঁটাতারবিহীন। এখান দিয়েই দিনের বেলায় কাফ সিরাপ ও নিষিদ্ধ পণ্য পাচার হয়। বিএসএফ জানে না এসব? প্রশ্ন তুললেন এক হিলিবাসী।

শুধু কি ফেনসিডিল?

তা কেন হবে? গোরু পাচারও তো চলে অবাধে। উজাল গ্রামবাসীরা বলছে, পাচারকারীরা ফসলের খেতগুলিকে রুট হিসাবে ব্যবহার করে। এতে জমির ফসলও নষ্ট হচ্ছে। যদি প্রতিবাদ করে কেউ তাহলে প্রাণে মারার হুমকি ফাউ মেলে। গোরুদের সাংকেতিক ভাষাও আছে। ছোট পেপসি, বড় পেপসি, ট্যাবলেট ইত্যাদি নামকরণ করে সংকেত আদানপ্রদান চলে।

সিম কার্ডের এত ডিমান্ড?

হ্যাঁ। হিলির ঘরে ঘরে বাংলাদেশি সিম কার্ড ভরতি। আবার ওপারেও ভারতের সিম কার্ডের চাহিদা ব্যাপক। আর এই সিম কার্ড দিয়ে মোবাইল নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে ঢিলেঢালা নিরাপত্তার সুযোগ নিয়েই চোরাকারবারিদের রমরমা। চোরাকারবারিরা মোবাইল নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়েই কাঁটাতারবিহীন জায়গা দিয়ে কখনও কখনও রাতের অন্ধকারে ফেনসিডিল, গোরু পাচার চালায়। তাই মুদির দোকান, পানের দোকান, লটারির দোকানে সিম কার্ডের এত রমরমা। মোবাইলের দোকান তো আছেই।

তাহলে তো জঙ্গিরা যখন-তখন...

সে আর বলতে! এই তো বাংলাদেশে পরপর দু'বার জঙ্গি হানা হয়ে গিয়েছে। সীমান্তে ঢিলেঢালা নিরাপত্তার সুযোগে জঙ্গিরা তো যে কোনও সময় ঢুকে পড়তেই পারে। কারণ এটা এখনও ফ্রি করিডর। কিছুদিন আগে বর্ধমানের খাগড়াগড় বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডে অভিযুক্তরা তো হিলি সীমান্ত দিয়েই পার হয়েছিল। আরও বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। গোয়েন্দারা বলছেন, হিলি এখন জঙ্গিদের সফ্‌ট টার্গেট।

তাহলে করণীয় কী?

কাঁটাতারবিহীন অংশে কাঁটাতার দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার অবিলম্বে। নিরাপত্তা জোরদার করা দরকার। সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত। টহলদারির পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন। কারণ জঙ্গিরা টার্গেট করেছে হিলি সীমান্তকে। ওয়াকিবহাল মহল বলছে, এক্ষুনি সচেতন না হলে বিপদ ঘরের দুয়ারে চলে আসবে।

কী বলছেন কমান্ডিং অফিসার?

হিলি সীমান্ত যাঁর দেখভালের প্রাথমিক দায়িত্ব, সেই ১৯৯ নম্বর ব্যাটেলিয়নের কমান্ডিং অফিসার জিতেন্দ্র সিং বিনজি বলছেন, 'বাংলাদেশে জঙ্গি হানার পর আমরা নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করেছি, সীমান্তে টহলদারি বেড়েছে। আমরা প্রতিদিনই ৮-১০ জন সন্দেহভাজনকে প্রয়োজনে জিজ্ঞাসাবাদ করে আটক করছি। কাঁটাতারের ব্যাপারটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

তাহলে?

তাহলে আর কী? হিলি সীমান্তের বাণিজ্যিক গুরুত্ব যেমন বাড়ছে, তেমনই একে নিয়ে চিন্তাও বাড়ছে। অবিলম্বে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে সতর্ক না হলে বড়সড় বিপদ ঘটা কিন্তু সময়ের অপেক্ষা। আমরা বুঝছি, কিন্তু গা লাগাচ্ছি না। সেটা যত দ্রুত হয়, ততই মঙ্গল।

সবুজ মিত্র

রবির আলোয় কি কুলিক পক্ষীনিবাসের দুর্দশা ঘুচবে?

১৯৭০ সালে রাজ্যের বন দপ্তর যেখানে বনসৃজন প্রকল্প শুরু করেছিল, ১৯৮৫-তে সেই এলাকা 'কুলিক পক্ষীনিবাস'-এর তকমা পায়। বনসৃজনে সাফল্য পাওয়ায় এলাকাটি অরণ্যে পরিণত হয় এবং সেই কারণেই পক্ষীনিবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ইচ্ছে প্রকাশ করে বন দপ্তর। এই নিবাসের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে কুলিক নদী।

পক্ষীনিবাস গড়ে তোলার ভাবনা অলীক ছিল না। ইংরেজি 'ইউ' আকৃতির এই পক্ষীনিবাসে পাখিদের আনাগোনা ক্রমশ বাড়ছিল। ২০০২-এর গণনা অনুসারে আগত পাখির সংখ্যা ৭৭,০০০-এর সামান্য বেশি ছিল। ২০০৮-এ সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৯১,৫৪০। গড়ে ফি-বছর ৭০ থেকে ৮০ হাজার পাখি আসে এই পাখিরালয়ে।

হ্যাঁ। পাখিরা আসে। তাদের দিক থেকে দায়িত্বপালনে কোনও ত্রুটি নেই। কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কুলিকে এসে বলে গিয়েছেন যে, সেখানে মনোরম পরিবেশে পর্যটকদের দু'দণ্ড বসার জন্য জায়গা তৈরি হবে। আম-কাঁঠাল গাছ লাগানো হবে। ডিয়ার পার্কও করার ইচ্ছে আছে, তবে সেটা বন দপ্তরের অনুমতিসাপেক্ষ। পক্ষীনিবাস লাগোয়া মণিপাড়াতে সাত বিঘে জমির উপর ইকো পার্ক বলে একটা বস্তু আছে। সে পার্ক ২০১০ সালে তৈরি হয়েছিল স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে। বেশ জনপ্রিয় ছিল সে পার্ক। একটা কাঠের পুল বেয়ে কুলিক নদী পেরিয়ে ওপারে গেলেই বিনোদনের দিব্যি আয়োজন। ছিল বোটিং-এর ব্যবস্থা।

মন্ত্রী মহাশয় যে দিন এসেছিলেন, সে দিন সে পার্কে কি গিয়েছিলেন? তিনি কি দেখেছিলেন যে এক গন্ডা বোট বিকল হয়ে

পড়ে আছে? কাঠের সেতুটি যে যখন-তখন ভেঙে পড়তে পারে তা টের পেয়েছিলেন তিনি? সংক্ষেপে বললে, ইকো পার্ক কেবল নামেই আছে এখন। আসলে সেটা গোস্ট পার্ক। পর্যটকরা সেখানে গেলে পয়সা ফেরত চাইবেন।

দেড়শোরও বেশি প্রজাতির পাখি আসে এই পক্ষীনিবাসে। এখনও তারা কথা রাখছে। কিন্তু আর ক'দিন? কুলিক নদীর জল ওদের চাই। সেখানে ভেসে থাকা আছে। খাবার সংগ্রহ করা আছে। কিন্তু সে নদীর পূতিগন্ধময় হয়ে ওঠার কাহিনি কি জেনেছেন রবীন্দ্রনাথবাবু? গবাদি পশুর মৃতদেহ কুলিকের জলে ফেলা হয়। স্নান করানো হয় গোরু-মোষ। ভিন রাজ্য থেকে থার্মোকলের বাক্সে মাছ নিয়ে আসা ট্রাকচালকরা ব্যবসায়ীদের নির্দেশে কুলিকের জলে বিসর্জন দিয়ে যান ফাঁকা বাক্স। রাশি রাশি সাদা বাক্সে ভরে ওঠে কুলিকের বুক। নদীর চরে ভুট্টা চাষ হয়। স্থানীয় পরিবেশপ্রেমী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যবসায়ী এবং নাগরিকরা মিলে একবার নদী সাফাই করেছিলেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে।

তারপর কি স্বচ্ছতোয়া হয়েছে কুলিক নদী? পাখিরা কি পাচ্ছে তাদের প্রার্থিত মাছ, শেওলা, শামুক? রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সে দিন কুলিকে এসে জানিয়েছেন, সেখানে সীমানা প্রাচীর তৈরি হবে। এটা আশার কথা। কারণ পক্ষীনিবাসে রাতের আঁধারে অনেক মানুষ ঢুকে পড়ে। সেই রহস্যময় মানুষরা নিঃশব্দে গাছের ডালে ঘুমিয়ে থাকা পাখিদের খুন করে। নিয়ে যায় খাওয়ার জন্য। ডিমও নিয়ে আসে বাড়িতে সেদ্ধ করে খাবে বলে। পাখিরালয়ে প্রহরী আছে। তারা রাতে পাহারা দেয়। তবুও ঢুকে পড়ে সেই রহস্যময় মানুষরা। সীমানা প্রাচীর দিয়ে এদের অনুপ্রবেশ কতটা ঠেকানো যাবে, যদি প্রহরীরা 'কিছু না দেখে'? পক্ষীনিবাসে তির-ধনুক নিয়ে শিকারিও দেখা যাবে, যদি নজর রাখেন।

উন্নয়ন মন্ত্রী বলেছেন কচ্ছপের জন্য উপযুক্ত জলীয় পরিবেশ গড়ে তুলতে। বলেছেন প্রজাপতিদের উৎসাহ দিতে। তারা যাতে ফুলে ফুলে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে। ধরে নিচ্ছি মন্ত্রীর সম্মানরক্ষার্থে পাখিরা আসবে, প্রজাপতি উড়বে, কচ্ছপও না হয় কঠিন জীবনীশক্তির প্রমাণ দিয়ে বেঁচে থাকতে চাইবে প্রাণপণে। কিন্তু মানুষের কর্তব্যপালন হবে তো? এখনও পর্যন্ত রাজ্য পর্যটন মানচিত্রে কুলিক পক্ষীনিবাসের গুরুত্ব আছে। পর্যটক নেহাত কম আসেন না এখানে। বহু পরিবেশপ্রেমী রায়গঞ্জকে চিনেছেন এই পক্ষীনিবাসের

কিন্তু বনমন্ত্রী কই? উন্নয়নমন্ত্রী তাঁর প্রথম কুলিক পাখিরালয় পরিদর্শনে উত্তেজনা চেপে রাখেননি। কুলিকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য তাঁকে মোহিত করেছে। পাশেই সুসজ্জিত পর্যটন নিগমের অতিথি নিবাস যে কুলিককে একটি আদর্শ পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করতে সক্ষম তা বুঝতে দেরি হয়নি তাঁর। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে বনমন্ত্রী কোথায় গেলেন? কুলিক নিয়ে তাঁর কি কোনও মাথাব্যথা আছে? মন্ত্রী হওয়ার পর তিনি ক'বার কুলিকে গেছেন?

দৌলতে। দাবি করা হয় যে, এটাই এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম পক্ষীনিবাস। কিন্তু পর্যটকরা এখানে এসে ফিরে যান বিশ্বের বৃহত্তম হতাশা নিয়ে।

বস্তুত, নিঃশব্দে, আইনকানুন-নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তিলে তিলে ভিতর থেকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে এই পক্ষীনিবাস। মন্ত্রী বলেছেন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর টাকা দেবে পাখিদের খুশি থাকার জন্য, পর্যটকদের আনন্দিত হওয়ার জন্য। টাকা নিশ্চয়ই আসবে। সীমানা প্রাচীরও তৈরি হবে। কিন্তু তারপরও কি নিরাপদ থাকবে অতিথি পাখির দল কিংবা উজ্জ্বল প্রজাপতি অথবা নবীন কচ্ছপরা? প্রাচীর কি পারবে পাখি চোরদের আটকাতে? কুলিকের জলে রাশি রাশি আবর্জনা নিক্ষেপে রাশ টানা হবে কীভাবে? মণিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, ইকো পার্কের হাল ফেরানোর মতো টাকা তাদের নেই।

তাই মন্ত্রীর আগমনের কারণে কুলিক পক্ষীনিবাস একদিনের জন্য সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিল। রায়গঞ্জের মানুষ সে সংবাদ প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু আশান্বিত হতে পারেননি। কারণ তাঁরা হাড়ে হাড়ে জানেন যে পাখিরা দায়িত্ববান। তারা নিয়ম করে আসে। অথচ সেই দায়িত্ববোধের ছিটেফোঁটাও তাঁরা প্রশাসনের মধ্যে দেখেননি এখনও।

রবির আলো সত্যিই কি পড়বে ভবিষ্যতের কুলিক নদীর ধারে?

নিজস্ব প্রতিবেদক

তরঙ্গ উত্তরঙ্গ

৩০

গতকাল রাতে খুদিদার বাড়ি থেকে হিদারু ফিরেছিল ভারমুক্ত মনে। বাড়ি ফিরে বউয়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছে। সন্তানদের সঙ্গে খুনসুটি করেছে। তারপর রাতে গভীর ও শান্তির ঘুম দিয়েছে। আজ ভোরবেলায় যখন সদ্য-ওঠা সূর্যের আলো তাদের বাড়ির পিছনের বাঁশবাগানের মাথায় এসে সবে পড়েছে, তখন হিদারু অতি প্রসন্ন মনে শয্যাত্যাগ করেছিল। ঘুম থেকে ওঠার পর শহরে একটা চক্কর দিয়ে আসাটা ছিল তার এক সময়ের নিত্যকর্ম। ইদানীং ব্যাপারটা প্রায় ঘটতই না। কেবল বাজারের প্রয়োজনে বার হত একটু বেলা করে। আজ সে অনেকদিন পর প্রাতঃভ্রমণের উৎসাহ নিয়ে বেরিয়েছে ঘুম থেকে ওঠার পরপরই।

মন অনেক সময় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। শীতের ছোঁয়া লাগা ঠান্ডা হাওয়ায় অঘ্রানের ভোরে শিশির ভেজা মাটির পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে হিদারুর মনে হচ্ছিল কথাটা। উপেনকে সে তারিণী বসুনিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এর পরে তার আর কী-ই বা করার থাকতে পারে? গগনেন্দ্রর সঙ্গে সঙ্গে সে একটু বেশিই ভেসে যাচ্ছিল ঘটনাপ্রবাহের স্রোতে। মূল ব্যাপারটা আগে বুঝতে পারেনি সে। খুদিদার জামাই হতে যাচ্ছে গগনেন্দ্র। এই অবস্থায় উপেনকে খুঁজে বার করার জন্য হিদারুর প্রয়োজন কোথায়? খুদিদার সঙ্গে হিদারু একটা ব্যাপারে একমত। ইংরেজদের বিরুদ্ধে উপেনের বোমা-বন্দুক নিয়ে লড়াইতে নামার কোনও প্রয়োজন নেই। সে ফিরে আসুক। অহিংস পথে দেশের হয়ে হাঁটুক। এর পরেও যদি উপেন নিজের রাস্তায় চলতে চায়, তবে হিদারু কী-ই বা করতে পারে?

বড় রাস্তায় উঠে একটা বন্ধ দোকানের সামনে বাঁশের স্থায়ী বেঞ্চিতে বসল হিদারু। শহরের কাজকর্ম শুরু হয়ে গিয়েছে। কলার খোলায় মাছ নিয়ে জেলেরা চলেছে বাজারের দিকে। মুটের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে দার্জিলিং মেল থেকে নামা যাত্রী চলেছে হেলেদুলে বাড়ির পথে। একটু দূরে কুস্তির ছোট আখড়া থেকে হুপহাপ শব্দ ভেসে আসছে। গোরুর গাড়ি বোঝাই সবজি যাচ্ছে দিনবাজারের দিকে। এদিক-ওদিক থেকে পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে উনুন ধরানোর ধোঁয়া। দক্ষিণে গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে টাউন ক্লাবের কাঠের গ্যালারি। হিদারুর মনে হল

যে, এ বছর সে একটাও ফুটবল ম্যাচ দেখেনি সেখানে। অনেকদিন কংগ্রেসের দপ্তরেও যাওয়া হয় না। কত ছেলে এখনও পালিয়ে আছে। চেনাজানা কতজন জেলবন্দি। আইন অমান্য নিয়ে শহরে যে কাণ্ড হল, সেই কাণ্ডে হিদারু তো প্রায় অনুপস্থিত!

অথচ বাড়িতে প্রতিদিন নিয়ম করে তার বউ চরকায় সুতো কেটেছে। তার কাটা সুতোর পাক এখন বেশ ভাল হয়। সে সুতো বাজারে বিক্রিও হয়ে যায়। উপেন বর্মনের নির্দেশ মেন সে রোজ সুতো কাটতে বসে ভোরবেলায় উঠে।

হিদারুর মনে হল, উপেন বর্মনের সঙ্গে একবার দেখা করবে। তিনি কি শহরে আছেন? তাঁকে কি কম লড়াই করতে হচ্ছে! উপেন বর্মনের কাছের লোক যজ্ঞেশ্বর একদিন এসেছিল হিদারুর বাড়িতে। সে দিন উপেন বর্মনকে নিয়ে অনেক গল্প শুনিয়ে গিয়েছে। ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ার সময় হস্টেলের সুপার ফণী চাটুজ্জে হঠাৎ ঘোষণা করলেন যে, ছাত্ররা জাত অনুযায়ী আলাদা ঘরে বসে খাবে। উপেন বর্মন এর প্রতিবাদ করেছিলেন। এর ফলে তাঁর ফ্রি স্টুডেন্টশিপ কাটা যায়। শেষে প্রিন্সিপাল সিংবাবু ফণী চাটুজ্জেকে ডেকে কড়া ধমক দিয়েছিলেন।

কখনও কখনও হিদারুর মনে হয়েছে যে, টাউনে তাদের মতো দেশি, রাজবংশীরা বড় অবহেলিত। জলপাইগুড়ি টাউনে ভাটিয়ারাই সংখ্যায় বেশি। তাদের হাতেই প্রায় সব কিছু। হিদারু বুঝতে পারে যে, এদের কেউ কেউ অন্যরকম হলেও বেশির ভাগই যেন তাদের দিকে একটু তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকায়। চারুচন্দ্রর মধ্যে দেশি লোকদের প্রতি যে ভালবাসা আর সহানুভূতি হিদারু দেখেছে তা বিরল। অথচ টাউনের বাইরে গান্ধিজির ডাকে সাড়া দিয়ে দেশি জোতদাররা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ক্ষতির দিকটা ভেবে দেখেনি। গ্রামের সাধারণ দেশি মানুষগুলিও দাঁড়িয়েছে কংগ্রেসের পতাকার তলে। কিন্তু এর কতটুকু মূল্য আছে টাউনের বাবুদের কাছে? রাজবংশীদের যুদ্ধ করার দক্ষতা কি কম? হিদারু যখন কৈশোর পেরিয়েছে, তখন বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধ শুরু হল। সেই যুদ্ধে ইংরেজদের সেনাবাহিনীতে দেশি যুবকরা যোগ দিয়েছিল দলে দলে। পঞ্চানন ঠাকুর উদ্যোগ নিয়েছিল। দেশি ছেলেরা ফ্রান্সের হয়েও যুদ্ধ করতে গিয়েছিল। উপেন বর্মনও উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেনাদলে দেশি যুবকদের যোগদান করাতে।

ভাবতে ভাবতে বিভোর হয়ে পড়েছিল হিদারু। হঠাৎ তার খেয়াল হল, সকাল খানিকটা গড়িয়ে গিয়েছে। রোদ্দুরে ঝলমল করছে চারদিক। রাস্তায় মানুষের যাওয়া-আসা, গোরুর গাড়ি, ঠেলাগাড়ির যাতায়াত অনেক বেড়ে গিয়েছে। হিদারু উঠে দাঁড়ায়। তারপর আপন মনে হাঁটতে শুরু করে পথ ধরে। সে ধরল দিনবাজারের উলটো দিকে টাউন ক্লাবের দিকে চলে যাওয়া পথ। পথের দু'ধারে বাড়িঘর নেই বললেই চলে। কেবল কয়েক পা এগিয়ে গেলে পশ্চিম দিকে নিখিল লাহিড়ির কয়লা আর কাঠের গুদাম। হিদারু চলতে লাগল। টাউন ক্লাবের উলটো দিকে ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টরের বাংলো। দক্ষিণ দিকে চলতে চলতে পাওয়া যাবে পিডব্লিউডি অফিস। তারপর ডান দিকে ঘুরে হিদারু পেরিয়ে গেল ইন্দ্রাজমল স্কুল, শিবাজি ময়দান। হিদারু এবার করলা নদীর পুল পেরিয়ে হাঁটতে থাকে পোস্টাপিসের দিকে। সাহেবদের কবরখানা আর অনুকূল মুখার্জির বাড়ির মাঝ দিয়ে আসে ফণীন্দ্র দেব বিদ্যালয়ের কাছে। উলটো দিকে লাল রঙের দালান। মুনসেফ কোয়ার্টার সেটা। শিরীষ, বাঁশ আর রবার গাছের জঙ্গলে ভরা চারদিক। গাছপালার ফাঁক দিয়ে সিগারেট কোম্পানির বাড়ি দেখা যাচ্ছে। হিদারু চলল সোজা। নরেন ভিলার গভীর বাগানের ভিতর দিয়ে চলে এল কামিনী রাহুতের বাড়ির পিছন দিকে। চাঁদমল বাটিয়ার পাটের গোলা পেরিয়ে, রেল স্টেশন আর ডাকবাংলো ঘুরে, রেললাইনের পাশ দিয়ে তিন নম্বর গুমটি টপকে হিদারু হাঁটতে লাগল পান্ডাপাড়ার পথে। জগদেও সিং-এর বাড়ির সামনে বিশাল চেহারার বলদগুলি জাবর কাটছিল। তিনি মাল পরিবহণের ব্যবসা করেন। সে বাড়ি পেরিয়ে বিশাল মাঠ। মাঠের পর রাইস মিল, বাকালি হাউস, আবার ধু ধু মাঠ আর মাঠ। পান্ডাপাড়া গ্রাম পর্যন্ত বাড়িঘর আর নেই বললেই চলে। মাঠের ওপারে নয়ারহাটের গাছপালা চোখে পড়ে। হিদারু সেই ফাঁকা মাঠের কোনায় একটা বড় গাছের নিচে বসল।

আর ঠিক তখনই একটা সাইকেল এসে থামল গাছটার সামনে। আরোহী একজন সুদর্শন যুবক। হিদারু তাকে চেনে। তার নাম করুণা। ধনী পরিবারের সন্তান। পচাগড় থেকে হরেক জিনিস আমদানির ব্যবসা তাদের। করুণা আর্যনাট্য সমাজের সদস্যও বটে। তবে বেশির ভাগ অভিনয়েই তাকে দেখা যায় সখী সাজতে। আর্যনাট্যে মেয়েদের ভূমিকা ছেলেরাই করে।

'কী ব্যাপার হিদারুদা? আজকাল দেখাই যায় না তোমায়!' করুণা হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, 'পরের শনিবার আমাদের নতুন প্লে হচ্ছে জানো তো? কলকাতা থেকে একটা দল এসেছিল গেল হপ্তায়। আমরা সেই দল থেকে দুটো ছেলেকে ভাঙিয়েছি। সখীর পার্ট করে।'

বাইরের দল অভিনয় করতে এলে যদি দেখা যায়, সে দলে সখীর পার্ট করার জন্য ভাল দেখতে ছেলে আছে, তবে আর্যনাট্যের লোকরা তাদের 'তুলে' নেয়।

'তুমি এখানে কী করছ?'— করুণা আবার প্রশ্ন করল।

হিদারু একটু হেসে বলল, 'টাউনটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখছি করুণা। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?'

'শরীরচর্চা করছি। সকালে পাঁচ মাইল সাইকেল চালালে শরীর মজবুত হয়। জেফারসন সাহেব সে দিন এসেছিলেন বাড়িতে। বাবাকে নিয়ে শিকারে যাবেন। তিনি অ্যাডভাইস দিলেন।'

হিদারু মজা পেল। বলল, 'জেফারসন সাহেবটা কে?'

'জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুলের কাজ দেখতে এসেছেন শুনলাম। আমাকে বলেছেন মন দিয়ে অ্যাক্টিং করতে। পলিটিক্সের চাইতে অ্যাক্টিং করা ঢের ভাল, তা-ই না হিদারুদা?

'গান্ধিজির ডাকে তুমি সাড়া দিতে চাও না?'

হিদারুর প্রশ্নে করুণার চোখে-মুখে এক ধরনের তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠল। সে চোখ সরু করে হিদারুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা বলেন, গান্ধি একটা বাজে লোক। বিলেতের টাকা পায় আর মুভমেন্টের ভান করে। টাউনের ছেলেরা সব হুজুগে মেতেছে। গ্রামের বাহেরাও বোকার মতো ওদের ফলো করছে।'

হিদারু স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল করুণার দিকে। 'বাহে' শব্দটা উচ্চারণের মধ্যে উপচে পড়া তাচ্ছিল্যের সুরটা তার বুকে ধাক্কা মেরেছে। 'বাহে' সম্বোধনটা তাদের কাছে অতি আদর আর স্নেহের ডাক। করুণার গলায় সেই শব্দটা যেন ধর্ষিত হল এই মুহূর্তে।

'তুমি তোমার কাজে যাও করুণা। আমার এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।'— হিদারু বলল। তার বলার ভঙ্গিতে অপ্রত্যাশিত কঠোরতা লক্ষ করে করুণা আর কথা বাড়াল না। নিঃশব্দে সাইকেলে প্যাডেল মেরে এগিয়ে গেল শরীরচর্চা করতে। মনোরম হেমন্তের সকাল, শিরশিরে হাওয়া, পাখির ডাক, খোলা মাঠ কিছুক্ষণের জন্য বিস্বাদ হয়ে গেল হিদারুর কাছে। তার মনে বারবার ধাক্কা খেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল একটাই শব্দ— 'বাহে! বাহে! বাহে!'

হায় কংগ্রেস! হায় গান্ধি! হায় টাউনের বাবু! অব্যক্ত বেদনায় হিদারুর দু'চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

অরণ্য মিত্র

পরি ঘোষালকে নিয়ে কনক দত্ত কী জানতে পারলেন জগন্নাথ সম্পর্কে? শ্যামল অন্তর্ধানের কোনও নতুন সূত্র কি পেলেন তিনি? যুব নেতা নবেন্দু মল্লিকের সুসময় যেন শেষ হতে চাইছে না। এবার অবসরের জন্য তিনি শুক্লা দাসের কাছে যাবেন দু'টি জিনিস নিয়ে। তার মধ্যে একটা হল সুগন্ধি বিদেশি কন্ডোম। অন্য দিকে, অজ্ঞাতবাসে থাকা কেএলও জঙ্গি পল অধিকারীর সন্ধানে দাসবাবু কীভাবে পা ফেলছেন? চোরাই কাঠ চেরাইয়ের বেতাজ বাদশা নদিয়া মুখুজ্জেকেও এবার দেখা যাচ্ছে কাহিনির অন্যতম চরিত্র রূপে। শরীরের ফাঁদে পুরুষকে টেনে আনা সুষমা, যৌনতা বিক্রির ব্যবসায় স্বেচ্ছায় আসা মনামি, নীল ছবির কারবারি নবীন রাই-সহ আরও অন্ধকার চরিত্রের আনাগোনায় জমজমাট মেগাসিরিয়াল এবার কোন দিকে?

৪৩

কার্তিক পাল একটা প্লাস্টিকের বাটিতে সাদা রং গুলছিলেন। এবার তাতে সামান্য নীল মেশালেন। মিনিট পাঁচেক রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে নীলটা মিলিয়ে দিলেন সাদায়। এবার তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল রংটা পছন্দ হয়েছে। সামনেই সরস্বতী পুজো। কার্তিক পালের সামন বেশ কয়েক জোড়া নানান সাইজের হাঁস। শুকিয়ে গিয়েছে। এবার সেগুলো সাদা করার ইচ্ছে নিয়ে কলকারখানায় বসেছেন তিনি। রঙের প্রথম পরতটা দেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। যদিও শীতের সময়, কিন্তু হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি এলে দিন নষ্ট হবে।

একটা ছোট সাইজের হাঁস টেনে নিয়ে খানিকটা সাদা মাখালেন কার্তিক পাল। ভাল করে দেখলেন মাটির রঙের উপর কতটা সাদা থাকল। সন্তুষ্ট হয়ে গোটা হাঁসটিকেই দ্রুতহাতে সাদা করে নামিয়ে রাখতেই দেখলেন একটা গাড়ি এসে কারখানার সামনে দাঁড়াল। দু'জন শহুরে লোক গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসতে থাকল তাঁর দিকে।

'আপনি কার্তিকবাবু তো?'

দু'জন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যিনি কথা বললেন, গাড়ি তিনিই চালাচ্ছিলেন। কার্তিক পাল একটু সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। সরস্বতীর অর্ডার কিন্তু বন্ধ। বয়স হচ্ছে তো।'

'আমরা পুজো কমিটির লোক নই। এদিককার মৃৎশিল্পীদের নিয়ে কাগজে লিখব বলে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'বসেন।' কার্তিক পাল কাস্টমারদের বসার জন্য পুরনো বেঞ্চিটা দেখিয়ে দিলেন। কনক দত্ত ইতিমধ্যে মাপার চেষ্টা করছিলেন তাঁকে। বসতে বসতে বললেন, 'আপনি মোবাইল ব্যবহার করেন না শুনলাম।'

'হয় না বুঝলেন? যন্তর-টন্তর আমি ভাল বুঝি না।'

'তা ঠিক।' কনক দত্ত চারদিকটা একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। খুবই সাধারণ কারখানা। বাঁশের বেড়া দিয়ে দেয়াল। উপরে পলিথিন দেওয়া। সব মিলিয়ে চল্লিশ বাই ষাট ফুটের একটা ঘর। কিছু মুণ্ডুহীন প্রতিমা। মাটি। পাটের কুচি। খড়। দড়ি। বাঁশ।

'আপনার নামে কেউ মোবাইল নিয়েছে?'

কনক দত্ত স্বাভাবিক গলায় প্রশ্নটা করলেন। কার্তিক পালের চোখে-মুখে কোনও উদ্‌বেগ লক্ষ করা গেল না। তিনি একটু হেসে বললেন, 'আমার একটা ধম্মছেলে আসে। সে নিসে।'

'তার নাম কি জগন্নাথ?'

'জানেন নাকি? বেশ। হ। জগন্নাথ। তবে তারে বেশ ক'দিন দেখি না। কাজে-টাজে বাইরে যায়। তা বলেন, কী জানতে চান? প্রতিমা গড়ার লোক আর থাকবে না বুঝলেন? জগন্নাথরে কত বললাম, বাঁচি থাকতে সিইক্ষে নে। বলে লাভ নাই। পয়সা নাই।'

'এখন কি সে পয়সা কামাচ্ছে?' কনক দত্ত খুব সাবধানে জগন্নাথ-প্রসঙ্গ বিশদ হওয়ার

চেষ্টা করলেন, 'বললেন, যে বাইরে যায়, কাজেই তো যায়, তা-ই না?'

'কয়েক মাস হল যাচ্ছে। কোথায় যায়, সে কথা অবশ্য জানা যায় না। পষ্ট করে কয় না কিসু। টাকা কিসু পায় তা বোঝা যায়।'

'আপনার ভোটের কার্ড দিয়ে মোবাইলের সিম নিয়েছে। মানে আপনার নামে সিম।'

'মোবাইল কিইনা দিলাম যখন, তখন সিম আমার নামেই হইসিল। এগুলো আমার বিশেষ জানা নাই।' আপন মনে উত্তর দিতে দিকে কার্তিক পাল হঠাৎ থেমে গেলেন। মাটির হাঁস থেকে কনক দত্তর দিকে চোখ তুলে একটু বিস্ময়ের গলায় বললেন, 'আপনারা কি জগন্নাথকে চিনেন? সে কি কিসু করসে?'

'আপনার কি মনে হয় সে খারাপ কিছু করতে পারে?'

কনক দত্ত ঠান্ডা গলায় প্রশ্নটা করলেন। কার্তিক পাল একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'সেলেটা ভাল। তবে পড়াসুনায় মাথা সিল না। বাইরে যায়া কাজকাম কইরা পয়সা আনে জগন্নাথ— কী যে করে! দুইটা লোক আসছিল একবার অর লগে দেখা করতে। দেইখ্যা ভাল লাগে নাই। সে দিন কাজে ত হঠাৎ গেল। সোনাপুরের কাসে দুইটা খুন হইসিল সে দিন। রাতের বেলা কী এক ফোন আসলো। বলল, তখনই যাইতে হবে।'

'তারপর থেকে আর আসেনি?'

'না। খবরও নাই। এই কারখানা আর পিসনে আমার বাড়ি লয়া বারো কাঠা জমি আসে। এসব কার হবে কন? আমার ত কেউ নাই! এই বাজারে ব্যবসা করত। কে যে কী বুঝাইছে ভগবানই জানে। দুষ্ট বুদ্ধিদানের লোক ত কম নাই অজকাল। তাই ভাবলাম কিসু করসে কি না। সামনেই কাঁঠালপাড়াতে এক মাস্টারের সেলে সে দিন ধরা পড়সে ব্যাঙ্ক ডাকাতির দায়ে। বোঝেন কাণ্ড!'

কনক দত্ত এবার উঠে দাঁড়ালেন। জগন্নাথ নামক ছেলেটা তার ধম্মবাপের নামে নেওয়া সিম কার্ডটাই ব্যবহার করেছিল— এটা এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল। নিয়োগকারী কে তা অজানা। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, সেটা একটা অর্গানাইজড কিছু। তাঁর অভিজ্ঞতা বলছে যে কার্তিক পাল কিছু লুকাচ্ছেন না। তিনি বরং জগন্নাথের কাজকর্মের প্রতি সন্দেহের কথাটা খুলে বলতে পেরেছেন। তাঁর মনে সংগত কারণেই খটকা লেগেছিল। মনে হয় এতদিন উপযুক্ত শ্রোতা পাননি বলে বলতে চাননি।

'জগন্নাথকে আমরা চিনি না।' বললেন কনক দত্ত, 'আসার সময় একটা দোকানে চা খেতে আর আপনার ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে থেমেছিলাম। সেই দোকানের লোকই জগন্নাথের কথা বলেছে। তবে চিন্তা করবেন না। জগন্নাথ হয়ত ভাল কিছুই করছে। ওকে একবার জিজ্ঞেস করে নেবেন। তা আপনার কাজ চলছে কেমন?'

কার্তিক পাল যেন একটু নিশ্চিন্ত বোধ করলেন কনক দত্তর কথায়। তারপর বলতে শুরু করলেন তাঁদের জীবিকার বর্তমান অবস্থা, সংকট, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি। প্রায় ঘণ্টাখানেক আশ্চর্য ধৈর্য নিয়ে শুনলেন কনক দত্ত সেই বৃত্তান্ত। তারপর সঙ্গীকে বললেন, 'কয়েকটা ফোটো তুলে নিন।'

অনেকক্ষণ পর একটা কাজ পেয়ে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পরি ঘোষাল।

৪৪

দীর্ঘ অপেক্ষার পর ভাগ্যদেবী যখন চোখ মেলে চান, তখন তাঁর চারটে চোখ গজায়। কথাটা নবেন্দু মল্লিক ছোটবেলায় শুনেছিলেন। ইদানীং তিনি কথাটার মর্ম বুঝতে পারছেন। তাঁর ক্ষেত্রে ভাগ্যদেবীর বোধহয় দু'গন্ডা চোখ গজিয়েছে। গত এক পক্ষে যা যা ঘটেছে, তা নবেন্দু মল্লিকের কাছে এখনও কোনও কোনও সময় স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। চার চারটে কমিটির সদস্যপদ লাভের পর ঘণ্টাখানেক আগেই জেনেছেন যে কলকাতা থেকে দলের প্রথম সারির একজন শক্তিমান নেতা জেলায় আসছেন সভা করতে। তিনি সভা শেষে দার্জিলিং চলে যাবেন। তার আগে মাত্র চারজনের সঙ্গে একান্তে বৈঠক করবেন তিনি, যেখানে নবেন্দু মল্লিকের নাম আছে। জেলার সাংসদ-বিধায়করা যাঁর সঙ্গে একান্তে দুটো আলোচনার জন্য ছ'মাস আগে থেকে আসরে নামেন, সেই নেতা বিনা তদবিরেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন নবেন্দু মল্লিককে। এর মানে আরও কিছু অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা মাপের নেতা ফোন করছেন ঘন ঘন। সবাই নবেন্দু মল্লিকের সঙ্গে বসতে চায়।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। একটু আগে একটা ফোন এসেছিল। অজানা নাম্বার। কিন্তু হেলাফেলা করে ফোনটা ধরতেই ওপার থেকে কে জানি বলল, 'নমস্কার স্যার। বুদ্ধ ব্যানার্জি কথা বলবেন।'

সে এক অলৌকিক মুহূর্ত। বুদ্ধ ব্যানার্জি ওপার থেকে স্নেহ মাখা স্বরে নবেন্দুর প্রশংসা করলেন। বললেন, কন্যাসাথি এনজিও-র কাছ থেকে ভাড়া না নিলে এই মুহূর্তে তাঁর সুনাম আরও বাড়বে। সব মিলিয়ে আধ মিনিটের কথা। নবেন্দু মল্লিক শুধু কয়েকবার 'ইয়েস স্যার' ছাড়া আর কিছু বলার সুযোগ পাননি। শেষে বলতে পেরেছিলেন, 'মোস্ট থ্যাঙ্কিউ সার।' কন্যাসাথি এনজিও-র কাছ থেকে এর পর ভাড়া নেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। সামনের মাস থেকেই সেটা ফ্রি করে দেবেন তিনি। ব্যাপারটা অবশ্য সাংবাদিক সম্মেলন করে জানাতে হবে। তা ছাড়া সব কিছু তো আর টাকায় হয় না।

এসব ভাবতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে শুক্লা দাসের কথা মনে হয়েছে নবেন্দু মল্লিকের। সদ্য মাঘ মাস পড়েছে। হাড়গোড় কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো ঠান্ডা পড়েছ দু'দিন হল। শুক্লা দাসের কাছে যাওয়ার আদর্শ সময়। আগেই যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভাগ্যদেবীর আশীর্বাদের প্লাবনে সেদিকে সাঁতার কাটার সময় পাননি নবেন্দু মল্লিক। এখন তাঁর মনে হল, আগামী দু'-একদিন বিশ্রাম নেবেন। বিশ্রামের জন্য জরুরি দুটো জিনিস জোগাড় করতে হবে আজই।

'উত্থান তেল' পাওয়া কোনও চাপ নয়। দ্বিতীয়টার জন্য নবেন্দু মল্লিক বন্ধুকে ফোন করলেন। জয়গাঁওতে থাকে। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। সে ফোন ধরতেই নবেন্দু মল্লিক বললেন, 'একটা উপকার করবি ভাই?'

'নেতার উপকার!' বন্ধুর গলায় কৃত্রিম বিস্ময় শোনা গেল, 'ভুটানে শেলটার নিবি নাকি?'

'ইয়ারকি মারিস না। আমার বিদেশি কন্ডোম লাগবে। গন্ধওয়ালা।'

'বিয়ে করলি কবে?'

'ধ্যাৎ!' নবেন্দু মল্লিক লজ্জা পেলেন হঠাৎ, 'আমার কথা বলছি না। লাগবে।'

'পলিটিক্স করতে গেলে বিদেশি কন্ডোম লাগছে নাকি আজকাল! একবার কোন নেতা নাকি রাইফেলের ডগায় নিরোধ লাগানোর কথা বলেছিল।'

'সিরিয়াসলি লাগবে রে! খুব গোপনে জোগাড় করতে হবে।'

'হাই লেভেলের কোনও নেতা যাচ্ছে বুঝি রিসর্টে মেয়ে নিয়ে। যা ওয়েদার শালা!'

নবেন্দু মল্লিক বোকার মতো খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসেন। যে যা ভাবে ভাবুক। তাঁর জিনিস চাই। কিছুক্ষণ এসব নিয়ে আরও ঠাট্টাতামাশার পর বন্ধু বলল, 'কাল পেয়ে যাবি। ছ'টার প্যাকেট। ছ'রকম গন্ধ। খাঁটি বিদেশি মাল। পরলে মনে হবে কিছুই পরিসনি। বিনিময়ে ফালাকাটায় নেক্সট টাইম গেলে স্কচ তো?'

'যা চাইবি।'

ডিল হয়ে যাওয়ায় নবেন্দু মল্লিক আরও হালকা বোধ করলেন। লম্বা একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজের চেম্বারে বসে ভাবতে লাগলেন আসন্ন সাংবাদিক সম্মেলনের কথা। বাইরের ঘরে স্তাবকের দলকে অপেক্ষায় রেখে তিনি ভাবনায় বিভোর হয়ে গেলেন। বুদ্ধ ব্যানার্জি ছোট্ট একটা কথা বলেছেন ফোনে— 'নিজেকে উন্নত করো।' নবেন্দু

মল্লিক সে বিষয়ে ভাবতে লাগলেন। এটা ঠিক যে তাঁর বক্তৃতাটা বেশ একঘেয়ে। এেককবার কলকাতার একেক নেতাকে কপি করতে গিয়ে এখনও নিজের বক্তৃতাশৈলী খুঁজে পাননি তিনি। এবার সেটা উন্নত করতে হবে। কিন্তু কীভাবে 'উন্নত ভাষণ' দেওয়া সম্ভব? এর জন্য কি ভাল আবৃত্তিশিক্ষার প্রয়োজন আছে?

আবৃত্তির কথা ভাবতেই নবেন্দু মল্লিকের মনে এল পাড়ার 'কণ্ঠবাণী চর্চা' নামক আবৃত্তি স্কুলটার কথা। শিক্ষকের নাম সুকণ্ঠ দত্ত। বোয়ালমারি তারানাথ হাই স্কুলের টিচার। তাঁদের দলই করেন।

নবেন্দু মল্লিক মোবাইলের পাতা খুলে দেখলেন সুকণ্ঠ দত্তর নাম আছে। বিলম্ব না করে ফোন করলেন তাঁকে। কয়েকটা রিং-এর পর সুকণ্ঠ দত্তর গলা শুনলেন। বেশ ভারী আর মোলায়েম স্বরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ নবেন্দুদা! বলুন!'

'মাইকের সামনে ভাল বক্তৃতা দেওয়াটা একটু শিখিয়ে দেবেন স্যার?'

বিনয়ের সঙ্গে বললেন নবেন্দু মল্লিক। গুরু হলেন ঈশ্বরতুল্য। অবশ্য যতক্ষণ তিনি কথা শুনে চলবেন। কিন্তু ফোনের ওপারে থাকা সুকণ্ঠ দত্তও এটা জানেন। গুটিকয়েক বাদ দিলে অধিকাংশ রাজনীতিবিদের মাঝে মাঝে 'কালচারাল' হওয়ার বাই ওঠে। বড়লোকের খেয়ালের মতোই খুব অনিশ্চিত ব্যাপার সেটা। নবেন্দু মল্লিকের সেই বাই উঠলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

'আপনি চাইলে সেটা কয়েকদিনেই শিখে নিতে পারেন।' দ্বিগুণ বিনয়ের সঙ্গে জানালেন সুকণ্ঠ দত্ত। কারণ, যতদিন 'বাই' থাকে, ততদিন টু পাইস আসার সম্ভাবনা প্রবল। কলকাতায় দুটো-একটা প্রোগ্রামও জুটে যেতে পারে। রাজধানীতে প্রোগ্রাম করলে আর্টিস্টের খাতির বাড়ে মফস্সলে।

৪৫

জয় চণ্ডী স মিল-এর মালিক নদিয়া মুখুজ্জে ডুয়ার্সের চোরাই কাঠ চেরাই করে চুল পাকিয়ে পঁয়ষট্টি বছরে পা দিয়েছেন। আজ দুপুর থেকে মেঘলা ভাবটা কিঞ্চিৎ কেটেছে। কাল রোদ্দুর ওঠার সম্ভাবনা। রোদ্দুর উঠলে অবশ্য শীতও পড়বে ফাটিয়ে। এমনিতেই ক'দিন হল সোয়েটার পরে ঘুমাচ্ছেন নদিয়া মুখুজ্জে। রক্তের জোর কমে গিয়েছে। এখন শীতকালে ঠান্ডা লাগে। রাম খেয়েও কাটতে চায় না। ডাক্তার থেকে পরিবার— সবাই বলছে মদ-সিগারেট দুটোই ত্যাগ করতে। কিন্তু সেসব নাদান উপদেশ কানে তোলার পাত্র নন নদিয়া মুখুজ্জে। ইদানীং তিনি মেতেছেন নতুন এক রোমাঞ্চ নিয়ে। লাল চন্দন কাঠ চেরাই করে বেচবেন। সে কাঠ দিয়ে তৈরি হবে আসবাবপত্র। ভুটানের বাজারে তেড়ে বিকাবে। লাল চন্দনের বুদ্ধমূর্তি বানাতে পারলে দারুণ চলত। কিন্তু এর জন্য চাই আর্টিস্ট। কাঠ কুঁদে মূর্তি বানাতে পারে এমন একটা ছেলের খোঁজ পেয়েছেন এলাকাতেই। তাকে দিয়েই শুরু করতে হবে। গোড়ায় মাসে একখানা হলেই যথেষ্ট। বুদ্ধ নিয়ে এক্সক্লুসিভ আইটেম হলে ভুটানে টাকার পরিমাণটা কোনও সমস্যাই হবে না।

এটা ঠিক যে নদিয়া মুখুজ্জে রোমাঞ্চ পছন্দ করেন। ডুয়ার্সের বহু চোরাই কাঠ চেরাইয়ের বহু পুরনো পাপী ব্যবসা গুটিয়ে অন্য দিকে মন দিয়েছে। নদিয়া মুখুজ্জেরও অন্য ব্যবসা আছে। কিন্তু চোরাই চেরাই ছাড়েননি। ডুয়ার্সের কোন বনাঞ্চলে কারা কীভাবে গাছ কেটে চালান করে তা তিনি সরকারের চাইতে ঢের ভাল জানেন। অরণ্যের সরকারি আইন তাঁর প্রায় মুখস্থ। নবিশ আইএসএস পেলে বাজিয়ে দেখে মজা পান। সব মিলিয়ে বেশ রোমাঞ্চ। তবুও একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। লাল চন্দন চালানের কাজে যুক্ত ডুয়ার্সের লোকদের তিনি ভাল চেনেন। কিছু কাঠ ম্যানেজ করে শিল্পকর্ম করার নেশায় মেতেছেন কিছুদিন থেকে।

হালকা জঙ্গলের ধার দিয়েই তাঁর কারখানা। পিছনে কাঠ রাখার জন্য অনেকটা জমি। বাপের আমলে তৈরি বারো ফুট লম্বা খুঁটির উপরে দণ্ডায়মান কাঠের আপিসঘরে বসে এসব নিয়েই ভাবছিলেন নদিয়া মুখুজ্জে। দু'কামরার ঘর। দ্বিতীয় ঘরে বসেন তাঁর ম্যানেজার। আইনি চেরাইয়ের জন্য হরেক কাগজপত্রের দরকার হয়। এসব ঝামেলা সামলানোর জন্য ম্যানেজার আছে। বিনা কাগজের কাজে তাঁর কোনও ভূমিকা নেই। এখন অবশ্য কারখানায় কোনও দু'নম্বরি কাঠ নেই। দিন তিনেক আগে চোরাইয়ের শেষ লটটা চলে গিয়েছে। সরকারি লোক এইসব শান্তিপূর্ণ সময়েই ভিজিট করতে আসে। আজকালের মধ্যে তাদের কেউ কেউ আসবে বলেছে।

আপিসঘরের জানলা দিয়ে দেখা গেল, এক ব্যক্তি অলস চরণে কারখানার দিকে হেঁটে আসছে। অনেক সময় অতি কৌতূহলী পর্যটক আসে কাঠ চেরাই বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান অর্জন করতে। নদিয়া মুখুজ্জে তাদের চা-বিস্কুট খাইয়ে অতি উৎসাহ নিয়ে আধ ঘণ্টা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানদান করেন। পুলকিত পর্যটক গল্প করার মতো হরেক বিষয় নিয়ে ফিরে যায় তৃপ্ত মনে। অবশ্য গল্পগুলো নদিয়া মুখুজ্জের তৈরি করা। চাইলে তিনি রোমাঞ্চ গল্পের লেখকও হতে পারতেন। সত্যি গল্পগুলো পর্যটকদের বলার মতো পাগল নন বলেই নদিয়া মুখুজ্জে বেশ আমোদ পান পর্যটক এলে।

এগিয়ে আসা লোকটিকে অবশ্য পর্যটক বলে মনে হচ্ছে না। পর্যটকদের মধ্যে একটা ব্যস্ততা থাকে। এই লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছে নিজের বাড়িতে আসছে। জঙ্গলের আপিসে নতুন কেউ এল না তো? এ কি তেমন কোনও কর্মীর প্রতিনিধি?

নদিয়া মুখুজ্জের উত্তেজনা হল। তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে লোকটির আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিনিট দশেক পর দেখা গেল, লোকটি সিঁড়ি বেয়ে আপিসঘরের বারান্দায় এসে উঠল। তাঁরা দু'জন পরস্পরকে দেখতে পারছিলেন।

'কিছু বলবেন?' নদিয়া মুখুজ্জে অমায়িক হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

'মিস্টার মুখার্জি?' উলটো দিক থেকে গম্ভীর গলায় প্রশ্নটা এল। গলাটা শুনেই একটা চমক লাগল নদিয়া মুখার্জির। পরিচিত গলা। অনেকদিন পরে শুনছেন বলে লোকটাকে আন্দাজ করতে পারছিলেন না।

'আমিই। ভিতরে আসুন।' লোকটাকে চেনার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বললেন নদিয়া মুখুজ্জে। শতাব্দীপ্রাচীন কাঠের বিশাল টেবিলের উলটো দিকে বসে লোকটাও দেখছিল তাঁকে। এবার তিনি বললেন, 'আপনি নদিয়া মুখুজ্জে কি না, সে নিয়ে আমারও কনফিউশন হচ্ছিল। আফটার আ লং টাইম। এখনও চিনতে পারেননি?'

'দাসবাবু!' উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়লেন নদিয়া মুখুজ্জে, 'শালা আজ কার মুখ দেখে উঠেছি! পঁচিশ বছর পর দেখা! সেই শালা নাইনটি টু-তে লাস্ট গন্ডারের শিং কেটেছিলাম একসঙ্গে।'

'শুনলাম আপনি সেম টু সেম রয়ে গিয়েছেন। আমিও তা-ই।'

আপিসঘরে একটাই কাঠের আলমারি। তার ভেতর থেকে দুটো গেলাস আর রামের বোতল বার করে এনে টেবিলে রেখে নদিয়া মুখুজ্জে হাসিমুখে বললেন, 'আগে সেলিব্রেট করি। ওফ! কত কী মনে পড়ে যাচ্ছে! আপনার চলছে তো রাম?'

'অল্প দিন। আর একটা ইনফর্মেশন দিন তো।'

'বলুন।'

'দীননাথ চৌহান বলে এলাকাতে কাউকে চেনেন?'

নদিয়া মুখুজ্জে একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'একটা রিসর্টের ম্যানেজার কাম গাইড। অল্পস্বল্প পলিটিক্সও করে। কিন্তু সে মালের খোঁজ করছেন কেন?'

'কারণ আছে।' এক চুমুক কারণ টেনে বললেন দাসবাবু।

(ক্রমশ)

দেবপ্রসাদ রায়

দল ক্ষমতায়, অথচ নিজের শহর এবং কলকাতায় দলীয় দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে চলেছেন লেখক। একদিকে দারুণ উত্তেজনা আর আবেগের সময়, অন্য দিকে গোষ্ঠীতন্ত্রের তিক্ত স্বাদ। ১৪টা আসন পেয়ে বিধানসভা বয়কট করেছে বামেরা। যে যুব কংগ্রেসের হাত ধরে রাজ্যে কংগ্রেসের অভাবনীয় সাফল্য এল, তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। প্রিয়-সুব্রতর প্রতিদ্বন্দ্বীর তালিকা আনা হল ইন্দিরা গান্ধির গোচরে। থানায় থানায় খোলা হল কংগ্রেস ফাইল। একের পর এক কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় এবারের পর্বে।

১৫

সাতের দশকে আমাদের সরকার থাকলেও আমি যে খুব স্বস্তিতে কাটাচ্ছিলাম এমন নয়। আমহার্স্ট স্ট্রিটে থাকার সময় কাছেই থাকতেন সোমেন মিত্র। ইন্দোর অধিবেশনের পর জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি নারায়ণ করের খুন হওয়ার কথা আগেই বলেছি। নারায়ণ কর মারা যাওয়ায় আমরা সোমেনদাকে জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। সোমেনদা অনিচ্ছুকভাবে সে দায়িত্ব গ্রহণও করেন। প্রিয়দার নির্দেশেই আমি আর সুদীপ গিয়েছিলাম সোমেনদার কাছে প্রস্তাব নিয়ে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট আকার নেওয়ার পরেও প্রিয়দা মাঝে মাঝে আমাকে সোমেনদার কাছে গোপন বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজে নিয়োগ করতেন। আমার অনুপস্থিতিতে প্রিয়দাকে কেউ কেউ বোঝাত যে, দেবপ্রসাদকে বিশ্বাস করা উচিত হচ্ছে না। সে বিরোধী শিবিরের লোক।

ফলে আমি ছিলাম তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মিত্র তথা প্রিয়দার শিবিরের লোক। জলপাইগুড়িতে অনুপমদা, রাতুলদা, বিজয় মোহন্ত— এঁরা আমাকে স্থান দিয়েছিলেন শত্রু শিবিরে। তাঁরা ছিলেন মানুদাপন্থী। ওদিকে কালচিনির বিধায়ক ডেনিস লাকড়া মন্ত্রিত্ব পাওয়ায় আলিপুরদুয়ার শিবিরের সুবিধা হয়েছিল। ওরাই অরুণ মিত্রর শিবির পরিচালনা করত জেলায়। আগেই বলেছি যে, জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতির পদ চক্রান্তের শিকার হয়ে আমাকে হারতে হয়েছিল ভীষ্মর কাছে।

তাই '৭২-'৭৭ এ রাজ্যে কংগ্রেসের পুনরুত্থানের দশক হলেও আমার কাছে তা ছিল নিঃসঙ্গতার দিন। জেলায় এবং রাজ্যে কংগ্রেসের যুযুধান প্রতিটি শিবির আমাকে বিপক্ষের লোক বলে সন্দেহ করত। আমি রাজ্য নেতৃত্বের কাছে আনুগত্য প্রমাণের চেষ্টার ত্রুটি অবশ্য রাখতাম না, কিন্তু নিঃসঙ্গতা কাটেনি। তবুও এসবের মধ্যেই গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের কর্মীদের একটি ইউনিয়নের সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে আমি সাফল্য লাভ করেছিলাম। তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরীর পরামর্শে আদালতের রায় নিয়ে এসে ৩৮ জনকে যখন কাজে নিয়োগ করতে সক্ষম হলাম, রাতারাতি গোটা ইউনিয়নটাই আমার দখলে চলে এল। তারপর '৭৪ সালে মানুদাকে রাজি করিয়ে হোটেলটার সরকারিকরণ করেছিলাম। এটা ছিল আমার তখনকার সান্ত্বনা।

এদিকে সিদ্ধার্থশংকর রায় একের পর এক কংগ্রেসি নেতৃত্বকে মিসা-য় জেলে ভরছিলেন। এঁদের মধ্যে এআইসিসি-র সদস্য, দলীয় বিধায়করাও ছিলেন। দুর্নীতির তদন্তের জন্য ওয়াংচু কমিশন গঠন করেছিলেন। কোচবিহারের বিধায়ক সন্তোষ রায়ের মন্ত্রিত্ব চলে গিয়েছিল দুর্নীতির অভিযোগে। কিন্তু এসব ব্যাপার সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সাফল্য হিসেবে মানুষ মেনে নেয়নি। তারা এসব গ্রহণ করেছিল দলের দুর্নীতি হিসেবে। অথচ এসবই ছিল রাজ্য কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পরিণতি মাত্র।

এখন আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে, তখন আমরা যদি আমাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজেদেরই ধ্বংস না করতাম, তবে সাড়ে তিন দশকের বাম-শাসনের কোনও প্রশ্নই থাকত না। কিন্তু প্রিয়দা যে চেষ্টা করেননি তা নয়। '৭২-এ কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর তিনি দলকে, বিশেষ করে যুব কংগ্রেসকে গ্রামমুখী করে তোলার জন্য ডাক দিয়েছিলেন, 'গ্রামে চলো'।

এই কর্মসূচির দু'টি অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমাকে বলা হল মেদিনীপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম তেরপাখিয়ায় নদী পেরিয়ে ময়না ব্লকের শ্যামসাবাদ গ্রামে যেতে। বাসে চেপে তমলুক গিয়ে তারপর নৌকোয় চেপে নদী পেরিয়ে শ্যামসাবাদ পৌঁছে গেলাম। দুপুরবেলায় একজন সম্পন্ন চাষির বাড়িতে খাওয়াদাওয়া হল। বিকেলে গ্রামের

তারকেশ্বরের চপ-মুড়ির দোকানের নামডাক আছে। তাই ট্রেন ধরার আগে রাস্তার ধারের একটা দোকানে বসে চপ-মুড়ি খাচ্ছি। পাশের লোকটি হঠাৎ কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'মালের দাম তো বেড়ে গিয়েছে!' আমি ধরতে পারলাম না। তিনি সেটা বুঝতে পেরে বললেন, 'চাল! চাল!'

মানুষদের নিয়ে সভা। যুক্তফ্রন্টের চেয়ে আমরা অনেক বেশি দরদি বোঝাতে গিয়ে বললাম, বাম-আমলে ভূমিহীনদের বাৎসরিক লাইসেন্স দেওয়া হত, আমরা সেখানে পাট্টা দিচ্ছি। ওদের আমলে জমির মালিক আর আধিয়ারদের মধ্যে ফসল ভাগ করা হত ৬০:৪০ অনুপাতে। আমরা সেখানে, মালিক যদি চাষের খরচ না দেয়, তবে সে অনুপাত করে দিয়েছি ৭৫:২৫। সভায় একটা নীরবতা বিরাজ করছিল। আমি বললাম, 'কেউ কিছু বলবেন কি?' একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আজকের সভায় যিনি সভাপতি, আমি তাঁর আধিয়ার। তিনি আমাকে প্রাপ্য ভাগ দেননি।' তাকিয়ে দেখলাম, তিনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর বাড়িতে আমি আতিথ্য গ্রহণ করেছি!

পরবর্তী অভিজ্ঞতা আরও চিত্তাকর্ষক। তারকেশ্বরের বিধায়ক বলাইলাল শেঠ ছিলেন হুগলি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি 'গ্রাম চলো' কর্মসূচি সফল করার অভিপ্রায়ে জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে সম্মেলনের আয়োজন করলেন। তারকেশ্বরে ট্রেন থেকে নামার পর বলাই আরটিও-র সভাপতি হওয়ার দৌলতে স্ট্যান্ড থেকে একটি বাস আমাদের নিয়ে রওনা হল চৌতারা বলে একটা জায়গার উদ্দেশে। চৌতারা থেকে উদ্দিষ্ট গ্রামের দিকে যেতে হবে। ৬ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে অকুস্থলে পৌঁছানো গেল। আমরা গ্রামে গেলাম। কিন্তু গ্রামের মানুষগুলো দূরেই দাঁড়িয়ে রইল। আমরা যারা বাইরে থেকে গিয়েছি, তাদের নিয়েই সভা। যা-ই হোক, বেলা যখন গড়াচ্ছে, তখন চিন্তা হল, ফিরব কী করে! বলাইকে বললাম, 'এবার তো যেতে হয়।' সে বলল, 'যাও।' বুঝলাম হেঁটেই বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত যেতে হবে। হাঁটা শুরু করলাম। তখন স্থানীয় একটি ছেলে বলল, 'হাঁটবেন? আমি বরং সাইকেল নিয়ে আসছি। আপনি যদি ডবল ক্যারি করতে পারেন তাহলে আমাকে রডে বসিয়ে নিয়ে চলুন। ফেরার সময় আমি নিজেই চালিয়ে নিয়ে আসব।' অগত্যা রাজি হতে হল। গরমের দিনে ৬ কিলোমিটার ডাবল ক্যারি করে যে চেহারা নিয়ে বাসে চেপে তারকেশ্বর স্টেশনে এসে নামলাম, তার স্বীকৃতি পাওয়া গেল খানিক পরেই।

তারকেশ্বরের চপ-মুড়ির দোকানের নামডাক আছে। তাই ট্রেন ধরার আগে রাস্তার ধারের একটা দোকানে বসে চপ-মুড়ি খাচ্ছি। পাশের লোকটি হঠাৎ কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'মালের দাম তো বেড়ে গিয়েছে!' আমি ধরতে পারলাম না। তিনি সেটা বুঝতে পেরে বললেন, 'চাল! চাল!' তখন বুঝলাম যে আমার চেহারা দেখে তিনি আমাকে চালের চোরাকারবারি ঠাউরেছেন। তখন আন্তঃজেলা চাল ব্যবসায় নিষেধাজ্ঞা ছিল। আমি অবশ্য তাঁকে হতাশ করতে চাইলাম না। বললাম, 'আমি এ লাইনে কাজ করি না। আমার এলাকা হল বর্ধমান।' লোকটি তখন সবজান্তার হাসি হেসে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। ওদিকে ব্যবসায় ভাল লাভ আছে।'

গিয়েছিলাম গ্রাম চিনতে। ফিরে এলাম চালের চোরাকারবারির চেহারা নিয়ে!

তারকেশ্বরের অভিজ্ঞতা আরও একটি ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিল। সেটাও কখনও ভোলার নয়। '৭৪ সালে চুঁচুড়াতে উপনির্বাচন ছিল। হুগলি জেলায় শান্তিমোহন রায় ও গোপালদাস নাগের গোষ্ঠীর লড়াই তখন তুঙ্গে। অনেক টানাপোড়েনের পর গোপালদাস নাগের প্রার্থী শৈলেন চ্যাটার্জি দলের মনোনয়ন পেলেন। এটা সেই সময়, যখন 'শুধুই কংগ্রেস'। কাজেই শৈলেনবাবুর বিরুদ্ধে যিনি প্রার্থী হলেন— চন্দ্রকান্ত দে, তিনিও কংগ্রেসি, তবে নির্দল এবং শান্তিদার আশীর্বাদধন্য। অন্য দল, যারা প্রকাশ্যে প্রার্থী দিতে তখন সাহস পাচ্ছে না, তারাও ওর পাশে দাঁড়িয়ে গেল। ফলে প্রথম থেকেই পাল্লাটা নির্দলের দিকেই ঝুঁকে ছিল।

আমি তখন রাজ্য যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। সুদীপ সভাপতি। আমাদের পাঠানো হল শৈলেনবাবুর ভোট করতে। সরকার আমাদের, তাই ভোটের প্রচারে গিয়েও সার্কিট হাউসেই ব্যবস্থা হল। প্রথম দিনেই জানা গেল, যিনি প্রার্থী হয়েছেন, তিনি এলাকায় 'টায়ার চ্যাটার্জি' বলেই বেশি পরিচিত। কারণ, তাঁর টায়ারের ব্যবসা। তিনি রাতে এলেন। আমি তখন খালি গায়ে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রোফাইল দেখছি। আমার চুল, দাড়ি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ওঁকে ভীষণভাবে আকর্ষিত করছিল, আমি বুঝতে পারছিলাম। কারণ সুদীপের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি আড়চোখে বারবার আমাকে দেখছিলেন। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে বলেই ফেললেন, 'কাল সুদীপবাবু যখন মিটিং করবে, আপনি তখন নীচ দিয়ে ঘোরাঘুরি করবেন।' সুদীপ বলে উঠল, 'কী বলছেন? ও আমার জিএস। ও তো বক্তৃতা করতে এসেছে।' উনি বললেন, 'আরে, আমার অনেক বক্তা আছে, কিন্তু ওঁর মতো মস্তান একজনও নেই। উনি নিজের কাজটা করুন, তাতে আমার অনেক উপকার হবে।'

আমি ওঁর প্রত্যাশা বুঝতে পারলাম এবং ঠিক করলাম, এই পরীক্ষায়ও উতরাতে হবে। বড়বাজারের পালোয়ান ভাইকে বললাম, কিছু 'কাজের' ছেলে দাও, নইলে প্রার্থীর প্রত্যাশা পূরণ করা যাবে না। পালোয়ান ভাই এক ডজন ছেলে একটি ভ্যান-সহ পাঠাল। গাড়িতে বড় করে ৫০১ সাবানের বিজ্ঞাপন লেখা। শিবজি তিওয়ারি ছিল পালোয়ান ভাইয়ের ব্যক্তিগত রক্ষী। ওর রিভলভারটি নিতে হল কোমরের বেল্টে, গুলিসহ। কারণ শৈলেন চ্যাটার্জির প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে! দু'-একদিনের ভিতর আমি দেখলাম, আমার অন্য এক ভাবমূর্তি তৈরি হয়ে গিয়েছে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, চন্দ্রকান্তর মিছিল, আমায় দেখে স্লোগান দিচ্ছে— 'গুন্ডা দিয়ে ভোট করা যায় না, যাবে না।' ব্যাপারটা আরও জমে উঠল, যখন একদিন সন্ধের সময় রাম চ্যাটার্জিকে এক মোড়ের মাথায় রিকশায় বসে থাকতে দেখে আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'আপনি কি রাম চ্যাটার্জি? আমি মিঠু রায়।'

পরের দিন সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল, মিঠু রায় রাম চ্যাটার্জিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে। হঠাৎ করে আমার 'ইমেজ' পালটে গেল। স্থানীয় কর্মীরা এক-এক করে 'স্থানীয় প্রতিভা'দের আমার কাছে এনে জমা করতে শুরু করল।

—দাদা, এ পরান মণ্ডল, সদ্য জেল থেকে এসেছে, আপনি যা বলবেন তা-ই করবে।

আর-একদিন নিয়ে আসা হল মলয় চক্রবর্তীকে। তার উপর গোটা আটেক খুনের মামলা ঝুলছে। সে-ও আমার নেতৃত্ব মেনে নিতে এসেছে।

সবই ঠিক চলছিল, কিন্তু ভোটের দিন যে চন্দ্রকান্তর চন্দ্রগ্রাসে গোটা এলাকা ছেয়ে যাবে তা আগে বোঝা যায়নি। বিভিন্ন এলাকা থেকে এসওএস আসতে থাকল, 'আপনি আসুন, নইলে আমরা হেরে যাব।' আমি প্রথম দিন থেকেই জানতাম, প্রার্থী হারবে। কিন্তু আমি রাম চ্যাটার্জির বিকল্প নই— এটা ধরা পড়ার আগেই বেরিয়ে যেতে চাইছিলাম, কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না। দুপুরবেলায় খবর এল, মহসীন কলেজের সামনের বুথে ছাপ্পা ভোট হচ্ছে। কংগ্রেসের বুথে কেউ নেই। এবার আর না গিয়ে উপায়

ছিল না। ৫০১ গাড়ি নিয়ে সমস্ত সাঙ্গোপাঙ্গকে বগলদাবা করে যখন ঢুকলাম মহসীন কলেজের গলিতে, ওপাশ থেকে পাইপগানের গুলি ছুটে এল। আমি তখন নিচে, রাস্তায়। আমার পাশে ঘটনাচক্রে সুদীপের নিরাপত্তারক্ষী, কুণ্ডু। চোখের নিমেষে দেখলাম, ৫০১ গাড়িটা প্রায় ৫০ কিলোমিটার বেগে পিছন দিকে ছুটে বেরিয়ে গেল। গলির অন্য প্রান্ত থেকে চন্দ্রকান্তর সাঙ্গোপাঙ্গরা ডাকছে, 'আয় শালা। সাহস থাকে তো আয়।' আমি একা আর পাশে কুণ্ডু। কুণ্ডু তখন ওর রিভলভার বার করে নিয়েছে।

'দাদা ভয় পাবেন না। আমি আছি।'

কুণ্ডুর অভয়বাণীতে খুব ভরসা রাখতে পারছিলাম না। আবার ভয় পেয়েছি, সেটাও বুঝতে দিলে চলবে না। এমন সময় দেখি জনা ছয়েক সশস্ত্র পুলিশ কনস্টেবল একজন সাব-ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলের দিকে যাচ্ছে। ওদের বন্দুক জনতার দিকে তাক করা। বোধহয় তাদের দেখেই এলাকা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল।

আমি ফিরতে পারিনি দেখে ৫০১ আবার ফিরে এসেছে, এবার খালি গাড়ি। বাকিরা কোথায় জানতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। পাশ দিয়ে একটা বড় পুলিশ ভ্যান বেরিয়ে গেল। দেখলাম ৫০১-এর পুরো টিমটাই তাতে বসা। এভাবে 'ওয়ার্কার' কীভাবে 'প্রিজনার'-এ রূপান্তরিত হল— জানতে চেয়ে জানা গেল, আমার পাশে যারা দাঁড়াতে এসেছিল, তারা গুলির শব্দে শুধু না দাঁড়িয়ে পালায়নি, সামনে একটা পাঁচিল টপকিয়ে যে বাড়িটায় লুকানোর চেষ্টা করছিল, সেটা এসপি সাহেবের বাড়ি এবং পাঁচিল থেকে লাফিয়ে পড়ামাত্র এসপি-র স্ত্রী থানায় ফোন করে যথারীতি ওদের যেখানে যাওয়া উচিত, সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

আমি আর ওদের জন্য অপেক্ষা না করে সার্কিট হাউসে ফিরে এসে ল্যান্ডলাইনে ডিসি সাহেবের ফোন পেলাম— 'আপনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যান। চন্দ্রকান্তর লোকেরা আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

বুঝলাম, আর ৫০১-এ চেপে যাওয়া যাবে না। গাড়িটাকে সবাই চিনে ফেলেছে। শৈলেনবাবুর কাছ থেকে একটা গাড়ি চেয়ে নিয়ে কলকাতায় ফিরলাম। পরে গণনায় দেখা গেল, যা হবার তা-ই হয়েছে। চন্দ্রকান্ত জিতেছে।

দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে প্রচ্ছন্নভাবে মদত করার বাইরে সিদ্ধার্থশংকর রায় কিন্তু প্রচুর কাজ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। ১৯৭৫-এ বিশ দফা কর্মসূচি ঘোষিত হয়। এর অঙ্গ হিসেবে রাজ্যে যে নিরীক্ষণ কমিটি তৈরি করা হয়েছিল, সেখানে আমি স্থান পেয়েছিলাম সদস্য হিসেবে। এর ফলে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়েছিল কাজের খতিয়ান সংগ্রহের জন্য। তখনই দেখেছিলাম যে ভূমিহীন মানুষ জমি পেয়েছে, গৃহহীনরা ঘর পেয়েছে, আইআরডিপি থেকে গরিব মানুষরা ঋণ পেয়েছে। অথচ গ্রামগুলিতে কাজ দেখতে গিয়ে উৎসাহী বিডিও, এসডিও, বিএলআরও-দের মতো তরুণ টগবগে আধিকারিকদের উপস্থিতি দেখলেও দলের কর্মীদের দেখতাম না কোথাও। সিদ্ধার্থবাবুর এই কাজগুলির রাজনৈতিক সুফল গ্রহণ করার জন্য দলের পক্ষ থেকে কাউকে হাজির থাকতে দেখিনি।

আমি প্রথম থেকেই একটু অন্য মানসিকতার লোক ছিলাম। কোনও দায়িত্ব নিয়ে তা পালন না করলে নিজের সঙ্গেই প্রতারণা বলে মনে হত। '৭৪ সালে মানুদা চাইলেন যুব কংগ্রেস 'লেভি' সংগ্রহে সক্রিয়ভাবে অংশ নিক। তখন খাদ্য উৎপাদন আজকের চেহারা নেয়নি। এম আর এরিয়া-এস আর এরিয়া— নানা ধরনের রেশনিং ব্যবস্থা ছিল। বাধা ছিল আন্তঃরাজ্য ধান/চালের ব্যবসায়। পাশাপাশি কৃষকদের কাছ থেকে নির্ধারিত মূল্যে ধান সংগ্রহের একটা লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা থাকত। মোট উৎপাদনের একটা বিশেষ অংশ সরকারি মূল্যে সরকারকে দিতে হবে, তাকে বলা হত লেভি। জোর করে নয়, বুঝিয়ে, রাজি করিয়ে, লেভির ধান যাতে সরকারকে দেয়, তার জন্য গ্রামে গ্রামে কৃষকদের সভা করে বোঝানোর কাজ দিয়েছিলেন মানুদা। আশা ছিল যুব কংগ্রেস একদিকে যেমন সরকারের পাশে দাঁড়াবে, তেমনি সরাসরি কৃষকদের সঙ্গেও এই কাজটা উপলক্ষ করে একটা যোগসূত্র তৈরি হবে। ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার প্রয়োজনে আন্তঃরাজ্য ধান পাচার বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি ছিল।

আমাকে বলা হল ঝাড়গ্রাম যেতে। একদিকে বিহার, অন্য দিকে ওড়িশা। তখনও ঝাড়খণ্ড হয়নি। হাওড়া থেকে ভোরবেলা স্টিল এক্সপ্রেসে চড়ে ঝাড়গ্রাম আসতাম, তারপর সাইকেল নিয়ে মোহিত পাণিগ্রাহীকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম গ্রাম থেকে গ্রামে। পরিয়াটি, জাম্মুনি, দইঝুড়ি, গিধনি, ধরসা, ওরো, সাকরাইল— সব জায়গার কৃষকদের বোঝানো হত, কেন লেভি দেওয়া উচিত। কেন বিহারে ধান-চাল পাচার করা ঠিক হচ্ছে না। কারণ বেশ কিছু গ্রামের লোকেদের মূল পেশাই ছিল বিহারে চাল পাচার করা। রাতে পার্টি অফিসে নিখিল মাইতি, সুকুমার মহাপাত্র, টেক বাহাদুরদের সঙ্গে আড্ডা মেরে সেখানেই শুয়ে পড়ো। তুর্কি নেতা রামকৃষ্ণ সরকার এইসব কাজের অসারতা বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে হতাশ হয়ে বাড়ি চলে যেত। অফিসে কোনও ল্যান্ড ফোন ছিল না। শক্তি দত্তর গালা মালের দোকান থেকে কলকাতায় ফোন করে যোগাযোগ রাখতাম।

একদিনের কথা বলি। সাইকেলে ঘুরছি, আর বুঝতে পারছি যে পেটের ভিতরে একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। অনেক দমন করার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করতে হল। মোহিত বলল, 'এখানে আর কোথায় যাবেন? নদীর পাড়ে চলে যান।' তা-ই গেলাম। কিন্তু অবস্থানগত ত্রুটিতে আমি যা দিচ্ছি তা যে লতানো গাছটি নিচ্ছে, বাতাসের সহায়তায় সে আমার নিম্নাঙ্গে বহুলাংশ জুড়ে লেপন করে দিচ্ছে। একটাই ভরসা। জনমনিষ্যিহীন এলাকায়, দূরে বড় রাস্তায় কেবল মোহিত সাইকেল পাহারা দিচ্ছে। ফলে জন্মদিনের পোশাকে নদীতে নেমে দূষণমুক্ত হয়ে ফিরতে পেরেছিলাম। পরবর্তীকালে বাম-আমলে এই এলাকাগুলিই কিষেনজির নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মত্ত থাকায় কংগ্রেস ক্রমশ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। মানুষের কাছে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের কাজগুলি প্রচার না পেয়ে প্রচার পাচ্ছিল তাঁর দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল। এতে দলের ভাবমূর্তি ধুলোয় লুটাতে দেরি হয়নি। মানুষ একটা সুযোগ পেতেই '৭৭-এ কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজাড় করে দেয়। গ্রামে কংগ্রেসি নেতাদের অনুপস্থিতির সুযোগ দিয়ে বামপন্থীরা সংগঠন জোরদার করে ফেলে, এবং ক্ষমতায় এসে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের অনেক কাজ নিজেদের বলে প্রচার চালিয়ে যায়। অনেকে হয়ত জরুরি অবস্থা কিংবা নির্বীর্যকরণ কর্মসূচির কথা তুলবেন। দ্বিতীয়টি এ রাজ্যে সে সময় বাধ্যতামূলক কখনওই ছিল না, এবং জরুরি অবস্থা জারির কারণে ইন্দিরাজি প্রবল সমালোচিত হলেও, '৭৭-এর নির্বাচনে এ রাজ্যে কংগ্রেসের মূল কারণ তা কখনওই ছিল না। তার আগেই কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের চেহারা দেখে মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন।

পাশাপাশি আজ প্রশ্ন জাগে যে, '৭০-এর যুব কংগ্রেস যে আন্দোলনগুলি করেছে, তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী ছিল! '৭২-এ আমরা মজুত মাল উদ্ধারের জন্য আন্দোলন করলাম। কিন্তু মজুত মাল ধরাও পড়ল। ইলাস্ট্রেটেড উইকলিতে আমার আর সুদীপের ছবিসহ নিবন্ধ ছাপা হল বড় করে। 'রসুই' কারখানায় হানা দিয়ে আমি রঘুনন্দন মোদির বিরুদ্ধে অভিযোগকারী হয়ে বেশ হইচই ফেলে দিয়েছিলাম। সেগুলো কি নিজের দলের সরকারকে ছাপিয়ে আলাদা ভাবমূর্তি তৈরি করার কৌশল ছিল না? হয়ত ছিল। কারণ, পরের পদক্ষেপগুলি আরও বেশি করে এই ধারণাটারই পক্ষে সমর্থন জুগিয়েছিল।

(ক্রমশ)

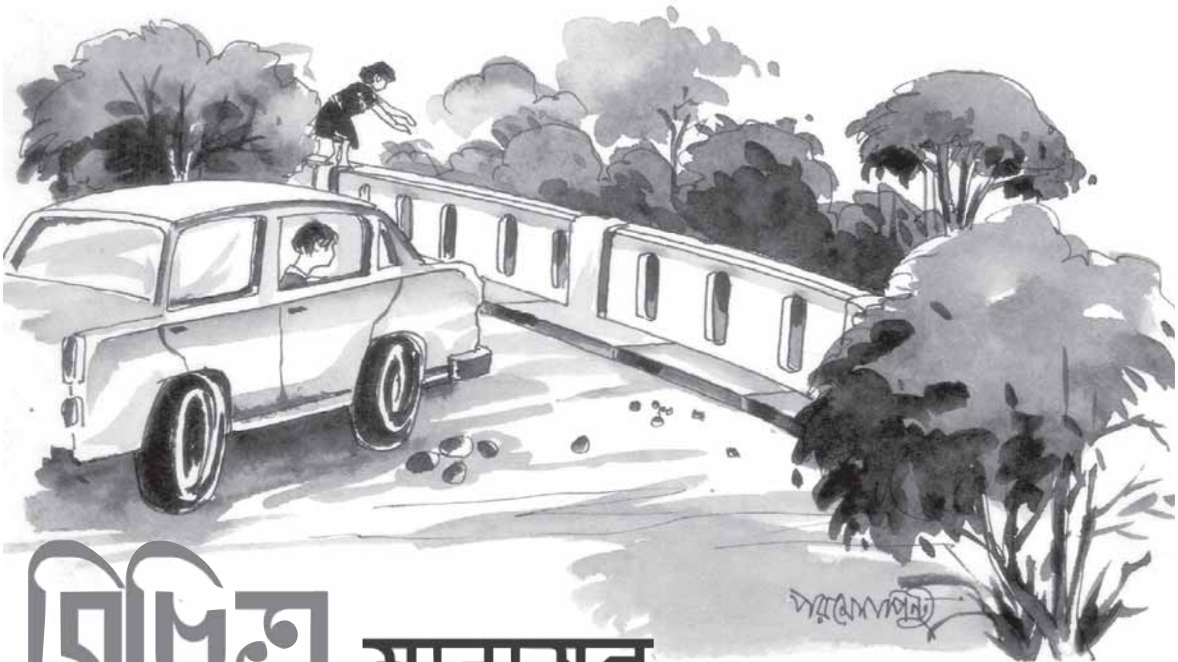

বিচিত্র মানুষের সচিত্র ডুয়ার্স

নির্মল মণ্ডল। হাটে হাটে অমৃতি বিক্রি করে সংসার চালাত। ডুয়ার্সে হাট একটি বিশিষ্ট চরিত্র। হাট না দেখলে, হাট থেকে কাচের চুড়ি, পাঁপড়, পাঁচমিশেলি চানাচুর কি দুধ কা ক্ষীর কা সন্দেশ না কিনলে সেই মজা টের পাওয়া যায় না। বেশির ভাগ রবিবার দিন হাট বসে। কখনও বসে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার। চা-বাগানের বাবুদের জন্য হপ্তায় একদিন হাট বসে। হাটে হাটে সাইকেল চালিয়ে অমৃতি বিক্রি করত নির্মল। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধে। তেমনই এক সন্ধের গন্ধ মাখা দিনে বিশু মণ্ডলের বউকে দেখেছিল নির্মল। বিশু মণ্ডলের বউ, যে কিনা আগুনে পুড়ে মরেছিল।

সত্যি-মিথ্যে নিয়ে বিশদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে ডুয়ার্সের বাতাসে এমনই একটা অপার্থিব সুর বাজে। এখন শহুরে বাতাসের হলকা বয়ে যায় বলে সেই সুরে মাঝে মাঝে তাল কেটে যাচ্ছে। কিন্তু এখন নয়া হলেও একটা সময় ছিল, যখন ভূত, প্রেত, জিন, পরি বিশ্বাস করত মানুষ। বন এক রহস্যময় জগৎ। এখানে কী আছে এবং কী নেই তা তর্কাতীত। কেবল নির্মল নয়, বহু মানুষ আছেন, যাঁরা অশরীরীর কাছাকাছি এসেছেন। গভীর রাতে বাড়ির সামনে দিয়ে ঘোড়া ছুটে যাওয়ার শব্দে ঘুম ভেঙে যেত গৃহস্থর। সেই অবাঙালি ভদ্রলোকের কথা না বললে ডুয়ার্সের কথা সম্পূর্ণ হবে না। আগে বলি বিরবিটি পুলের কথা। শিলিগুড়ি থেকে বীরপাড়ার দিকে যেতে পড়ে বিরবিটি পুল। দিনের বেলায় চিন্তা নেই। রোদ ঝলমলে দিন না হলেও অসুবিধা নেই। সন্ধে হলেও নয়। ঘটনা ঘটে ঠিক রাত দশটায়। তখন পুলের উপর ওঠা বারণ। অনেকেই নিয়মটা জানত। কেউ কেউ জানত না। এমনই একজনের থেকে শুনেছিলাম ঘটনাটি। তখন এই লাইনে সে নতুন এসেছে। ড্রাইভিং জানে। সেটাই তার জীবিকা। সে দিন যাত্রী পৌঁছে দিতে গয়েরকাটায় গিয়েছে সে। ফিরে আসতে আসতে রাত দশটা বেজে গেল। ঠিক বিরবিটি পুলের কাছে পৌঁছাতেই গাড়ি থেমে গেল। কিছুতেই গাড়ি নড়ে না। কী করবে ভাবছে, এমন সময় অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল তার চোখের সামনে। একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পুলের উপর দাঁড়াল। তারপর রেলিং-এর উপর উঠে লাফিয়ে পড়ল নিচে, নদীতে। ঝপাং করে শব্দ হল। ফের সব শান্ত! গাড়ির ভিতরে বসে এসব দেখে তার অবস্থা বোঝাই যায়। কী করবে এখন? লোকজন ডাকবে? নিজেও বাঁচাতে পারল না! গাড়ি চলছে না। লোককে খবর দেবে কী করে? এর পরেই গাড়ি স্বাভাবিকভাবেই স্টার্ট নিয়েছিল। ফিরে লোকজনকে জানাল, যদি মেয়েটাকে বাঁচানো যায়। দেখা গেল, সে-ই প্রথম নয়। তার আগেও বহু লোক এই ঘটনার সাক্ষী। অনেকেই এই মেয়েকে দেখেছে। কেউ কেউ ঝাঁপ দিতেও দেখেছে! পরবর্তীকালে যখন জনসংখ্যা বেড়েছে, তখনও ভূত ভাগেনি নিয়নের আলোয়। ডুয়ার্সে একটা গলির কথা শুনেছি। এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোক নাকি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন মধ্যরাতে! শুনেছি, দেখিনি কিন্তু। ডুয়ার্সের বনজঙ্গলের সঙ্গে মিশ খাইয়ে এসব অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ভূত আছে কি নেই, সেই প্রশ্ন এখানে অবান্তর। প্রকৃতি এমন নেশাগ্রস্ত করে রাখে যে, সম্ভব-অসম্ভব মিলেমিশে শরবত। বিহারের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসেছিল রামকুমার। তার দু'জন দেশোয়ালি ভাইয়ের সঙ্গে ঢুকে পড়ল বাঘ-চরা রাজ্যে। পানের দোকান দিয়ে ফেলল ওদের একজন। বাকিরা রিকশা চালাতে শুরু করল। এর পর তিনজন মিলে দেশ থেকে নিয়ে এল চতুর্থজনকে। নাম হীরা। এর পর এল লালন। বিহারে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে সেই বন রাজ্যে যারা এসেছিল, তারা নিজেরাও ভূতপ্রেতে আচ্ছন্ন ছিল। ডুয়ার্সের ছায়াচ্ছন্ন জীবনযাত্রায় সেটা আরও গেড়ে বসল। হীরা ছিল নিরামিষাশী। স্বপ্ন-দর্শনের ফলে আমিষ ত্যাগ। পুজোপাঠ,

গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে সিঁদুরের টিকা। হাবেভাবে অন্যরকম। মেপে কথা। হাসিতে সংযমের বাঁধ। সবাই সম্ভ্রম করে। হীরা এখন হীরাজি। মুশকিলে পড়ে গেল রামকুমার। কাজের লোক যদি গুরুদেব হয়ে ওঠে, তো কাজ করবে কি মালিক? সে শিবজির কাছে প্রার্থনা করে, 'জয় শংকরবাবা, হীরা কা বুখার অচ্ছা কর দিজিয়ে।' বাবা শুনলেন। হীরার এক স্বজনের মৃত্যু হলে শ্রাদ্ধের দিন হীরা গম্ভীর হয়ে বসে আছে। খাওয়ার পর্ব এলে হীরার আসন আলাদা রাখা হল। সে কিনা নিরামিষাশী! সাধু টাইপের আদমি। কিন্তু হীরা আসন এগিয়ে এনে আমিষাশীদের পাশে এসে বসল। কারণ কী? সবাই তো অবাক। হীরাজি কিনা এক পঙ্‌ক্তিতে! হীরা ব্যাখ্যা দিল, সে স্বপ্ন দেখেছে ফের। তার বাবা স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন, 'তুই মছ খ!'

মৃত ব্যক্তির বাত না শোনা গর্হিত কর্ম। সুতরাং একই দিনে হীরার আমিষভোজন এবং সাধুত্বলোপ। রামকুমার স্বস্তিতে আদেশ করে, 'এ হীরা! এক বালঠিন পানি লা। যা। অউর সুন, পানি লানে কে বাদ মেরে পয়ের দবা দেনা। অচ্ছি তরহ!' হীরা তাড়াতাড়ি আদেশ পালন করে।

হীরা ভূতের আদেশে জীবনযাত্রা পালটে দিয়েছে। লালনের অভিজ্ঞতা আরও সাংঘাতিক। রাতে তাড়ি খেয়ে বাড়ি ফিরছিল সে। তাল গাছের নিচে যে-ই না পৌঁছেছে, গাছ থেকে সরসর করে ভূত নেমে এল। এসেই বলে, 'দে, বিড়ি দে। খিলা দে বিড়ি।'

লালন রেগে গেল, 'কৌন রে?' বলতেই তার লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে দিল লালনের দিকে, 'দে দে, বিড়ি দে দে! দে দে দে-এ-এ।'

বাপ রে! ভাগ্যে বিড়ি ছিল। বিড়ি দিল লালন। দেশলাই বাক্স থেকে কাঠি নিয়ে আগুন জ্বালাই ভি দিল। বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ফের গাছে গিয়ে উঠল বাবাজি। মুশকিল হচ্ছে, লালনের ট্যাঁকে বিড়ি রাখতেই হচ্ছে। ওই গাছের তল দিয়ে তাড়ি খেয়ে যাওয়ার সময় ভূত এসে বিড়ি চায় রোজ। 'রোজ রোজ বিড়ি দেনা পড়তা হ্যায়।' লালনের গলায় কি ক্ষোভ নাকি?

—দাও কেন?

—দুখ লাগে! বিড়ি খিলায় খিলায়কে প্যাক্টিস করিয়ে দিলম। এখুনি বিড়ি না পাইলে উ তো মরিয়ে যাবে।

ভাল কথা। ভূত তাহলে বিড়ির অভাবেই মরে! মৃত্যুর পর পরশুরামের ভূতের মতো তারও কি মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়?

লালন অবশ্য এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি! বলেছিল, ভেবে দেখবে।

সাগরিকা রায়

ইন্দ্রায়ুধ-এর রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা

বাঙালির জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে দু'টি নাম— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলাম। আষাঢ়-শ্রাবণ মাস এলে তাই বাঙালির আবেগ একটা ভিন্ন মাত্রা পায়। ১০ জুলাই কোচবিহারের স্থানীয় স্টুডেন্ট'স হেল্‌থ হোমে ইন্দ্রায়ুধ-এর আয়োজনে কোচবিহারবাসী পেলেন একটি মনোজ্ঞ রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা। প্রতি বছর এই নাট্যগোষ্ঠী এ ধরনের অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে দুই নক্ষত্রকে তাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসছে।

১৯৭৪ সালের ৮ জুন থেকে ইন্দ্রায়ুধ-এর পথ চলা শুরু। বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ ৪২ বছর ধরে কোচবিহারের বুকে নাট্যচর্চায় নিয়োজিত এই গোষ্ঠী। তবে শুধু নাট্যচর্চাই নয়, সারা বছর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করে থাকে তারা। এ বছরও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি।

এ দিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের শুরুতে ইন্দ্রায়ুধ-এর পক্ষ থেকে রবীন্দ্র-নজরুল প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। উদ্‌বোধনী সংগীতের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। এর পর একে একে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গানের ডালি উজাড় করে দেন ঋজিতা সিনহা, মল্লিকা ঘোষ, অহনা সরকার, বাসবদত্তা চক্রবর্তী, অমিত ঘোষ, চঞ্চরিকা ভট্টাচার্য, পল্লব সরকার, দীপায়ন ভট্টাচার্য, সমীর গুহ, প্রজ্ঞামিতা গোস্বামী, মেহেক সুলতানা আঁখি, অরূপ দত্ত ও শুভ সূত্রধর। সংগীতের সুরমূর্ছনায় যোগ্য সংগত করেছিলেন তবলায় দেবাশিস চক্রবর্তী ও গিটারে শান্তনু কর। যন্ত্রসংগীতে সন্দীপা ঈশোর সকলের মন কেড়ে নেন। প্রিয়াংশী চক্রবর্তী, আত্রেয়ী মজুমদার, কিংশুক ভট্টাচার্য এবং অনন্যা সরকারের অপূর্ব নৃত্য পরিবেশন দর্শকদের মন কেড়ে নেয়। অনুপ মজুমদারের সঞ্চালনায় সন্ধ্যা সাতটায় শুরু হয়ে এই অনুষ্ঠান ছন্দে-সুরে ভেসে এগিয়ে চলে। উপস্থিত শ্রোতা ও দর্শক যে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সবচেয়ে বড় কথা, ইন্দ্রায়ুধ-এর দ্বিতীয় প্রজন্মের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান।

নিজস্ব প্রতিনিধি

পার্বণী কবিতা উৎসব

গত ৬ জুলাই শুভ রথযাত্রার দিন জলপাইগুড়ি সুভাষ ভবনে অনুষ্ঠিত হল পার্বণীর ষষ্ঠ জন্মবার্ষিকী। ছন্দবীথি কুন্ডা পরিচালিত 'পার্বণী' একটি সাংস্কৃতিক সংঘ। তাঁরা 'শব্দ উশিড়া' নামে একটি পত্রিকা বার করে চলেছেন গত ছ'বছর ধরে। পার্বণীর ষষ্ঠ জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের তাঁরা 'পার্বণী কবিতা উৎসব' নাম দিয়েছিলেন। সে দিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মা, অধ্যাপিকা কোয়েলা গঙ্গোপাধ্যায়, কবি শশাঙ্কশেখর পাল, জয়শীলা গুহ বাগচি, সপ্তাশ্ব ভৌমিক। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রচুর নবাগত কবি-লেখক। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন মানস ভৌমিক। উক্ত অনুষ্ঠানে উঠে আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে বেণু দত্ত রায়ের কবিতা।

'মা' প্রথম উচ্চারণ

শনিবার ৯ জুলাই জলপাইগুড়ি শহর থেকে প্রকাশিত হল গৌতম গুহ রায় সম্পাদিত গ্রন্থ 'মা'। এতে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজকের লেখক 'টি' অবধি অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির মা-কে নিয়ে স্মৃতিচারণ, কথা, কবিতা, চিঠি। যাবতীয় লেখালেখি 'মা' সংক্রান্ত। এই গ্রন্থ প্রকাশ উপলক্ষে গৌতমবাবু একটি ঘরোয়া উৎসবের আয়োজন করেন নিজ বাসস্থান মোহন্তপাড়ায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি শহরের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ। অনুষ্ঠানের শুভসূচনা এবং গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন ইন্দিরা সেনগুপ্ত। 'মা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত প্রায় সকলেই। মা-কে নিয়ে সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে চমৎকার বক্তব্য রাখেন অর্পিতা বাগচি। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন উমেশ শর্মা, মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, শাঁওলি দে, অনিন্দিতা গুপ্ত রায়, সুভাষ কর্মকার, প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গৌতম গুহ রায়।

স্মরণ অনুষ্ঠান

৬ জুলাই ছিল ডুয়ার্সের অন্যতম কবিতার কারিগর বেণু দত্ত রায়ের প্রয়াণবার্ষিকী। এক

বছর আগে এই দিনেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান। তাঁকে শ্রদ্ধা ও স্মরণ করবার তাগিদেই ১০ জুলাই রবিবার জলপাইগুড়ি সুভাষ ভবনে অনুষ্ঠিত হল বেণু দত্ত রায়ের স্মরণ অনুষ্ঠান। 'নীরব কোরক' পত্রিকার পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেন মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস ও শেখর কর।

'ধূমকেতু', 'জলছাপ' প্রকাশ

আজকাল হাতে লেখা পত্রিকার তেমন চল নেই। অনেকে হয়ত জানেনই না যে এরকম পত্রিকা হতে পারে। কিন্তু কিছু মানুষ থাকেন, যাঁরা এখনও এসব প্রাচীন ঐতিহ্য টিকিয়ে রেখেছেন। এমনই একটি সম্পূর্ণ হাতে লেখা পত্রিকা 'ধূমকেতু' গত পয়লা জুলাই, শুক্রবার হলদিবাড়ির পূর্বপাড়ায় এক ঘরোয়া আড্ডায় প্রকাশিত হয়ে গেল মধুমিতা চন্দ ও শাঁওলি দে-র যৌথ সম্পাদনায়। সমস্ত পত্রিকা সুন্দর হস্তাক্ষরে ভরিয়ে তুলেছেন যিনি, তাঁর নাম সুশান্তকুমার সেন।

এ ছাড়াও সে দিন সেখানেই শাঁওলি দে-র একক সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দেওয়াল পত্রিকা 'জলছাপ'।

জলপাইগুড়িতে 'নবোদিত ফেস্টিভ্যাল'

পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, ভারত সরকার সংস্কৃতি মন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত 'নবোদিত ফেস্টিভ্যাল' অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ২৩, ২৪ এবং ২৫ জুন জলপাইগুড়ির সরোজেন্দ্র দেব রায়কত কলা কেন্দ্রে। উদ্‌বোধনের দিন পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রর তরফে উপস্থিত ছিলেন অভিজিৎ চ্যাটার্জি, ছিলেন নৃত্যশিল্পী মোনালিসা ঘোষ, ছিলেন জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট গবেষক ড. বিমলেন্দু মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। সাতজন শিল্পীর নৃত্য-গীতে মেতে উঠেছিল সান্ধ্য অনুষ্ঠানের পরিবেশ। সে দিন যাঁরা অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন, তাঁদের মধ্যে ওয়াসিম রাজার গৌড়ীয় নৃত্য, পুনম বড়ুয়ার ভাওয়াইয়া, শতাব্দী সেনগুপ্তর কত্থকে মন্ত্রমুগ্ধ হন দর্শক-শ্রোতা।

দ্বিতীয় দিন দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান। প্রথম ধাপে ছিল কর্মশালা এবং পরের ধাপে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত চলে ভাওয়াইয়া গানের কর্মশালা জয়ন্ত বর্মনের তত্ত্বাবধানে। এর পর আড়াইটে থেকে প্রায় বিকেল ৫টা পর্যন্ত ওয়াসিম রাজা করালেন গৌড়ীয় নৃত্যের কর্মশালা। সান্ধ্য অনুষ্ঠানের আসর জমে উঠেছিল সুব্রত গগৈয়ের বাঁশির সুমিষ্ট সুরে। এ ছাড়াও যেসব শিল্পী সে দিন মঞ্চ আলো করে ছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই

তাঁদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, যা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শেষ দিন অর্থাৎ ২৬ তারিখেও কর্মশালার আয়োজন ছিল। সকালবেলার কর্মশালায় এ দিন উপস্থিত ছিলেন সুখবিলাস বর্মা এবং যূথিকা সরকার। নতুন ছেলেমেয়েদের মধ্যে নতুন উৎসাহের সঞ্চার ঘটিয়ে যান তাঁরা। শেষ সন্ধ্যায় আরও একঝাঁক শিল্পী তাঁদের নিজস্ব পরিবেশনার গুণে রাত প্রায় ১১টা পর্যন্ত দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখে দিয়েছিলেন। সুবর্ণা হোড় (মণিপুরি), দেবল দেব জানা (ভারতনাট্যম), অভিনব নন্দ (গজল) প্রমুখ ব্যক্তিত্ব অনুষ্ঠানটিকে এক অন্য মাত্রায় তুলে নিয়ে যান।

প্রোগ্রাম অফিসার, ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টার, মিনিস্ট্রি অব কালচার, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া, অভিজিৎ চ্যাটার্জির

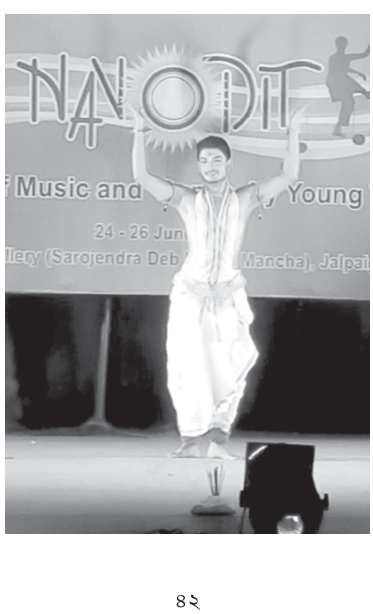

বক্তব্য অনুযায়ী, 'নবোদিত ফেস্টিভ্যাল' এমন একটি উৎসব, যেখানে একই মঞ্চে বিভিন্ন সংস্কৃতির আদানপ্রদান হয়। শুধু তা-ই নয়, নিজের রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের মানুষের যোগাযোগ হওয়ার সুযোগ ঘটে। গত দু'বছর হল এই উৎসবের শুরু। সারা দেশের মতো পূর্বাঞ্চলেও বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে চলে এই উৎসবের আয়োজন। জলপাইগুড়ির এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন সিকিম, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের মোট ২৫ জন শিল্পী, যাঁরা ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের স্কলারশিপ হোল্ডার। অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছিল কত্থক, ভারতনাট্যম, সত্রীয়, গৌড়ীয়, ওড়িশি, মণিপুরি, লোকনৃত্য, ভাওয়াইয়া, ধ্রুপদী সংগীত, বাঁশি এবং তবলায়। 'নবোদিত ফেস্টিভ্যাল'-এর আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের একটি এমন মঞ্চ তৈরি করে দেওয়া, যেখানে পারফর্ম করে তাঁরা নিজেদের বিচার করার সুযোগ পেতে পারেন। সেই সঙ্গে একে অপরের সঙ্গে নানান বিষয়ে মত বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের আরও উন্নত করার চেষ্টা করতে পারেন।

এ বছর শান্তিনিকেতনের পর জলপাইগুড়ি এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছে, যা অত্যন্ত আনন্দের তো বটেই, গর্বেরও। ঘরের ছেলে বাদশা (সৌগত মুখার্জি)-র ঐকান্তিক ইচ্ছে এবং উদ্যোগ না থাকলে হয়ত বা এত তাড়াতাড়ি জলপাইগুড়িতে এত বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হত না। সেদিক থেকে সৌগতকে কৃতিত্ব না দিয়ে উপায় নেই।

গ্রন্থন সেনগুপ্ত

বই পত্রের ডুয়ার্স

নেতাজিকে নিয়ে

১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসু দ্বিতীয়বার জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন' উপলক্ষে। মাত্র এক বছর আগেই তিনি হয়েছেন জাতীয় কংগ্রেসের তরুণতম সভাপতি। সুতরাং তাঁর দ্বিতীয়বার জলপাইগুড়ি শহরে আসার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনিই ছিলেন প্রধান অতিথি। সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। উক্ত সম্মেলনের বিস্তৃত পরিচয়দানের উদ্দেশ্যে 'জলপাইগুড়ি নেতাজি ফাউন্ডেশন' প্রকাশ করেছে আলোচ্যমান পুস্তকটি। সম্মেলনের গুরুত্ব, অতিথিদের ভাষণের অনুলিপি, স্বাধীনতা আন্দোলনে জেলার ভূমিকা বিষয়ক প্রবন্ধ, বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত উক্ত সম্মেলনের সংবাদ, প্রতিবেদন, বিশ্লেষণ সংকলিত হয়েছে এই পুস্তকে। শেষে বেশ কয়েকটি ফোটো। ভূমিকায় ফাউন্ডেশনের সম্পাদক ও জলপাইগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ রায় লিখেছেন, 'সর্বোপরি সম্মেলনের প্রধান অতিথি রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর ঐতিহাসিক জলপাইগুড়ি ভাষণ— ইংরেজি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে 'ভারত ছাড়ো' ডাক (ছয় মাসের চরমপত্র প্রদান প্রস্তাব), সম্মেলনের সভাপতি শরৎচন্দ্র বসুর অভিভাষণ, সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সংকলন এই পুস্তিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য।'

১৯৪২ সালে 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব জাতীয় কংগ্রেস গ্রহণ করে। কিন্তু এই প্রস্তাব প্রথম সুভাষচন্দ্র উত্থাপন করেছিলেন ১৯৩৯-এ। শহরের আরেক প্রাক্তন বিধায়ক ও খাদ্যমন্ত্রী নির্মল বসুর প্রবন্ধে এইদিকটি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। আনন্দগোপাল ঘোষের প্রবন্ধ থেকে জানা যাচ্ছে, 'জাতীয় কংগ্রেসের অনুকরণে বিরাট সম্মেলন নগরী গড়ে তোলা হয়েছিল। নগরসজ্জা ও তোরণ নির্মাণ করেছিলেন নন্দলাল বসুর ছাত্র শিল্পী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন কুমিল্লার জননেতা আশরাফুদ্দিন চৌধুরী।' উক্ত সম্মেলন যে 'আপসহীন বামপন্থী' ধারায় পরিচালিত হয়েছিল, তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন সুব্রত বাগচী। লেখার শেষে তিনি বলেছেন, 'ভারতবর্ষের বর্তমান সংকটে জলপাইগুড়ি অধিবেশনের গুরুত্ব আজ বিশেষ করে আলোচনার পটভূমি সৃষ্টি করেছে।' সুব্রতবাবুর রচনাটি সুলিখিত।

সুভাষচন্দ্রর ভাষণটি ঐতিহাসিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। সেই ভাষণের অনুলিপি এবং শরৎচন্দ্র বসু ও অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি চারুচন্দ্র সান্যালের ভাষণের অনুলিপি ছাপা হয়েছে পুস্তকটিতে। রয়েছে খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মুকুলেশ সান্যালের প্রবন্ধ। বিষয়— স্বাধীনতা আন্দোলনে জলপাইগুড়ি জেলা। গোবিন্দ রায়ের একটি প্রবন্ধ আছে, যার বিষয়বস্তু— স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজবংশী সমাজ। ফলে পুস্তকের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্মেলনের ফোটোগুলির মান ও ছাপা বেশ ভাল। এগুলি যে পুস্তকের অলংকার, তা নিয়ে দ্বিমত থাকা উচিত নয়। মোটের উপর একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সম্মেলনের প্রস্তুতি ও সূচনা পর্ব নিয়ে উমেশ শর্মার রচনাটি কৌতূহলোদ্দীপক। স্থানীয় 'দেশবন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে সম্মেলন করার লাভ ও ক্ষতি উভয়ই বিচার করে একটি চমৎকার বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। ক্ষতির মধ্যে অন্যতম— 'কংগ্রেস কর্মীদের চটকদার কাজের প্রতি লোভ বাড়ল।' অনেকগুলি লাভের একটি হল— 'সাময়িকভাবে কলিকাতায় নেতাগণের নিকট জলপাইগুড়ির নেতাদের মান ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া যাইবে।'

তবে পুস্তকটি আরও পরিকল্পিতভাবে প্রকাশ করা যেত। দেড়শো পাতার পুস্তকটির মূল্য কম রাখার জন্য মধ্যমানের কাগজে ছাপা হয়েছে। ছবিগুলি উচ্চমানের কাগজে ছাপা দরকার ছিল। প্রচ্ছদটিও খুব দায়সারা। তবে মুদ্রণ প্রমাদ প্রায় নেই বললেই চলে। পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

জলপাইগুড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় সম্মেলন ও সুভাষচন্দ্র বসু। প্রকাশক- জলপাইগুড়ি নেতাজি ফাউন্ডেশন। সংকলক- গোবিন্দ রায়। ১০০ টাকা।

অশোক সেনগুপ্ত

দেবেশ রায়কে নিয়ে

'কঙ্ক' পত্রিকার চতুর্দশ সংখ্যাটি দু'বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে 'দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা' রূপে। চারশতাধিক পৃষ্ঠার এই সংখ্যাটি নিয়ে অতিথি সম্পাদক ভেবেছিলেন, 'আর পাঁচটা সম্মাননা সংখ্যার মতো হবে না এটা।' স্বাভাবিকভাবেই এই আশা পূর্ণ হয়নি, কারণ লেখা সব পাওয়া যায়নি। 'শাহবাগ' আন্দোলনে জড়িয়ে থাকার কারণে বাংলাদেশ থেকে ঈপ্সিত রচনাগুলি হাতে আসেনি। কিন্তু যা পাওয়া গেল তা বড় কম নয়।

যাঁরা দেবেশ রায়ের লেখা পড়েছেন এবং ব্যক্তি দেবেশকে তেমন জানেন না, তাঁদের কাছে 'কঙ্ক' পত্রিকার এই 'সম্মাননা'র প্রথম দু'টি অংশ পর্যাপ্ত। এই অংশের লেখকদের অন্যতম হলেন শঙ্খ ঘোষ। 'কাকাই'কে নিয়ে তির্ণা রায়ের লেখাটি চমৎকার। দেবেশ রায়ের লেখা মাত্র আধ ডজন চিঠি পড়ে হয়ত অতৃপ্তি থাকবে পাঠকের।

দেবেশ রায়ের লেখাকে বিষয় করে হাসান আজিজুল হকের সাক্ষাৎকারটি মূল্যবান সংযোজন। সাক্ষাৎকারের অন্তিম পর্বে উনি বলেছেন, 'এই জন্যই আমরা দেখি, লেখকজীবনে দেবেশ যতই এগচ্ছেন, ততই তাঁর লেখা ঘোর জটিল হয়ে উঠছে।' অন্য দিকে 'তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত' প্রসঙ্গে সুমন মুখোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা চমৎকার। এর বাইরে তিন নম্বর অংশে দেবেশ রায়ের সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণ হয়েছে বেশ কয়েকটি রচনায়। এই অংশের শুরু সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের একটি ছোট চিঠি দিয়ে। চিঠির বিষয় হল দেবেশ রায়ের একটি উপন্যাস পড়ার প্রতিক্রিয়া। কোন উপন্যাস তা অবশ্য বোঝা যায়নি স্পষ্টভাবে। দেবেশ রায়ের রচনা পরিচয় তৈরি করেছেন সমরেশ রায়। অত্যন্ত পরিশ্রমী কাজ। সন্দীপ দত্ত তৈরি করেছেন 'পত্র-পত্রিকায় দেবেশ রায়'। গৌতম সেনগুপ্ত (অতিথি সম্পাদক) দেবেশ রায়ের অসামান্য কথনভঙ্গির স্বাদ পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন 'দেবেশ রায়ের কথোয়ালি'র মাধ্যমে। এটা না থাকলে 'সম্মাননা' অসম্পূর্ণ হত।

পত্রিকা সম্পাদকদ্বয় 'কথামুখ'-এ স্বীকার করেছেন, 'গত কয়েক বছরে' পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে দেবেশ রায়ের সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ভাষ্য তাঁদের পছন্দ হয়নি, কিন্তু সেই অপছন্দ তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল্যায়নে কখনওই অন্তরায় হতে পারে না। এই অকপট স্বীকারোক্তি ভাল লাগল। এই উদারতা সাহিত্যবিচারে আবশ্যিক। পত্রিকার প্রচ্ছদে দেবেশবাবুর মুখমণ্ডলের স্কেচটি হিরণ মিত্রর আঁকা।

কঙ্ক। 'দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা'। ২০১৪। যুগ্ম সম্পাদক- স্বপন পান্ডা, উৎপল সাহা। অতিথি সম্পাদক- গৌতম সেনগুপ্ত। কলকাতা-৫৯। ২০০ টাকা।

রজত অধিকারী

শ্রীমতী ডুয়ার্স

দু'হাতে সংসার ও লেভেল ক্রসিং সামলাচ্ছেন দীপিকা

আলিপুরদুয়ারে যখন পৌঁছালাম, আকাশভাঙা বৃষ্টিতে গাড়ির ওয়াইফাইও ঠিকঠাক কাজ করতে পারছিল না। একে-ওকে জিজ্ঞেস করে খুঁজতে লাগলাম আসাম গেট টু রেল গুমটি। আগের দিনই খবর পেয়েছি, এখানে রেল গেট ওঠানো-নামানোর কাজটি করেন যে মহিলা, তিনি এখন কয়েকদিন ধরে আসাম গেট টু-তে কর্মরত। আমাদের স্বাভাবিক চোখ মহিলাদের যেসব কাজে দেখে অভ্যস্ত, দীপিকার কাজটা ঠিক সেরকম নয়। আর সেটাই ওঁর কাছে আমাদের পৌঁছে যাবার একমাত্র আকর্ষণের কারণ। গুমটিতে যখন পৌঁছালাম, বৃষ্টিটা ধরেছে। ছোট্ট একটা ঘর, সেখানে খুব ছোট্ট একটা চৌকি। বসে আছে বছর বাইশের একটি ছোট্টখাট্ট মেয়ে। দীপিকা দে। এই তো পাওয়া গিয়েছে। আমি আর তন্দ্রা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। দীপিকা একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল প্রথমটায়। পরে অবশ্য স্বচ্ছন্দ হয়েই ওর কাজের ধরনটা নিজে হাতে দেখাল মেশিনের বোতামের উপর হাত রেখে। যাতায়াত করা ট্রেনের সংখ্যা যদিও কম, তবুও 'ডিউটি আওয়ারস' হিসেবে বারো ঘণ্টা থাকতে হয় তাকে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত। স্টেশন মাস্টারের ফোনে ইনস্ট্রাকশন এলে তবেই রেল গুমটি বন্ধ করতে হয়। যদিও বোতাম টিপেই কাজ হয় আজকাল, তবুও কখনও কখনও মেশিন খারাপ থাকলে শক্ত হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গেট ওঠানো আর নামানোর কাজটাও তারই সারার কথা। 'তবে হ্যাঁ, আমার কলিগরা খুব ভাল, ওটা এখনও আমাকে করতে হয়নি, ওঁরাই করে দিয়েছেন।' মিষ্টি হেসে জানাল দীপিকা। দীপিকার মতো আরও নাকি জনা দশেক এই একই কাজে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন ডুয়ার্সের বিভিন্ন গুমটিতে। তাঁদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছেন, যাঁরা এই হাতল ঘোরানোর কাজটিও একলাই সামলে নেন। প্রয়োজন হলে দীপিকাকেও তা-ই করতে হবে।

২০১০-এ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে উচ্চমাধ্যমিক এবং ১৮ পেরতে না পেরতেই চাকরি। বিয়ে হয়েছে এ বছর। শ্বশুরবাড়ি থেকেও সাপোর্ট পায় চাকরিটা বজায় রাখার জন্য। ওর সঙ্গে কথা বলে এটা অন্তত বুঝলাম, রেল গুমটির দায়িত্বে থাকা কর্মীর কাঁধে কত ভারী ওজন ভর করে থাকে। একদিকে দায়িত্বের গুরুত্বপূর্ণ দিকটা সামলানোর জন্য স্টেশন মাস্টার আছেন, কিন্তু মাস্টারের ফোন পাওয়া থেকে শুরু করে নির্বিঘ্নে ট্রেন চলে যাওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ দায়ভার বইতে হয় ওকেই। ফলে ছোট হোক বা বড়, কম হোক কিংবা বেশি, দায়িত্ব দায়িত্বই। সেটা ঠিকঠাক সামলে নিলে নিজের চাকরির ক্ষেত্রেও কোনও সমস্যা থাকে না, অনেক অঘটনও এড়িয়ে চলা যায়।

শ্বেতা সরখেল

শখের বাগান

বছরভর রঙ্গন

সারা বছর ফুল দেয় এমন গাছ বাড়িতে থাকলে বেশ হয়। রঙ্গন এমনই একটি গাছ। টুকটুকে লাল রঙের রঙ্গন থোকা থোকা ফুটে থাকে। এখন অবশ্য শুধু লাল নয়, হলদে, খয়েরি, গোলাপি রঙের রঙ্গনও পাওয়া যায়। বর্ষায় লাগালেই সব থেকে ভাল। এ সময় পুরনো কোনও ডাল কেটে লাগালেই চলবে। বড় টবে লাগানো যেতে পারে। তবে মাটিতে পুঁতলে ভাল হয়। আসলে গাছ অনেকটাই বড় হয়। বছরে একবার করে অবশ্যই বর্ষার আগে ডাল ছাঁটতে হবে। কোনও রাসায়নিক সার বা কীটনাশকের প্রয়োজন নেই। জৈব সার প্রয়োগ করলেই যথেষ্ট।

কৃষ্ণ চন্দ্র দাস

রূপসী ডুয়ার্স

হাত ও পায়ের যত্ন

টিপস্ দিচ্ছেন প্রখ্যাত বিউটিশিয়ান **মালা দাস**

সকাল সকাল কুর্চির ফোন, কাল রূপসার বাড়িতে পার্টি। সকলে প্রস্তুতিতে ব্যস্ত— একজন আর একজনকে ফোন করছে, কে কী

পড়বে, কে কীভাবে সাজবে। হঠাৎ মনে হল কুর্চির যতই সাজসজ্জার দিকে মন দিক কিন্তু ওর হাত ও পায়ের কোনও যত্ন নেই। আমি ফোন করে ওকে ম্যানিকিওর/পেডিকিওর করতে বললাম। উত্তর এল— সময় হবে না, আমি তো খুব রেগে গেলাম। একবার ভাবুন— সবাই দামি শাড়ি, গয়না, মুখে চড়া মেকআপ করবে কিন্তু হাতপায়ের যত্ন নেবার সময় টালবাহানা। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অপরূপা করতে হাত ও পায়ের যত্ন প্রয়োজন। আপনার হাঁটা চলায় আপনার ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। যখন দামি শাড়ি পরে হাঁটবেন তখন আগে পা-টা দেখা যাবে।

হাত ও পায়ের যত্ন বাড়িতে করতে পারেন— গরম জলে নুন, পরিমাণ মতো শ্যাম্পু দিয়ে কিছু সময় পা ও হাত ডুবিয়ে রাখুন। কিছুক্ষণ পর ব্রাশের সাহায্যে হাল্কা হাতে ঘসে নিন। এর জন্য আলাদা ব্রাশ পাওয়া যায়। এর ফলে মরা কোষগুলি চলে যাবে। এরপর ভাল করে ধুয়ে ফুট ক্রিম এবং হ্যান্ড ক্রিম লাগান। বাড়িতে প্যাক লাগাতে পারেন— দুধ, মুলতানি মাটি, মধু, দই, কিছু গোলাপের পাপড়ি বাটা মিশিয়ে লাগান। সপ্তাহে দুই-তিনদিন লাগাতে পারেন। ১৫-২০ মিনিট রেখে ভাল করে ধুয়ে ক্রিম লাগিয়ে নেবেন।

হাতে পায়ের নান রকম সমস্যা হয়, যেমন— নেল ফাঙ্গাল ইনফেকশন (নখে ছত্রাক ঘটিত সংক্রমণ), ইয়েলো নেল রিজ (হলুদ নখ), ব্রিটিল নেল (নখ ভেঙে যাওয়া) ইত্যাদি। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ঠিক পদ্ধতির ম্যানিকিওর ও পেডিকিওর দরকার। নখ ভাঙার সমস্যা খুব দেখা যায়, এর জন্য ঘরোয়া ভাবে ইষৎ উষ্ণ অলিভ অয়েলে ১০-২০ মিনিট আঙুল ডুবিয়ে রাখুন তারপর হালকা হাতে হালকা হালকা ম্যাসেজ করুন। এরপর শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেলুন। নেইল বেস পাওয়া যায়, সেটা লাগান। সস্তার নেলপলিশ লাগাবেন না, মাঝে মাঝে নেলপলিশ ছাড়া নখ রাখুন। ফলের রসের

সাথে জিলেটিন মিশিয়ে খান। ডিটারজেন্ট ব্যবহার করার সময় গ্লাভস ব্যবহার করুন। তবে মাসে-দু'মাসে পার্লারে গিয়ে ম্যানিকিওর/পেডিকিওর করুন। কারণ বিশেষজ্ঞরা আপনার সমস্যা ও ত্বক অনুযাই পরিচর্যা করবেন।

পার্লারে নানা ধরনের যত্নের ব্যবস্থা আছে, যেমন সাধারণ ম্যানিকিওর/পেডিকিওর, স্পা, ক্যান্ডেল থেরাপি বা স্পা, ডি ট্যান ম্যানিকিওর/পেডিকিওর, পায়ে ব্যথার সমস্যা থাকলে এর উপকার হয়। এর ম্যাসাজে উপকার হয়। এই রিফ্লেক্সোলজি ম্যাসাজে শরীরের ক্লান্তি ও অনেক সমস্যা দূর হয়। আজকাল ডাক্তাররাও পেডিকিওর করার জন্য বলে থাকেন। হাত ও পায়ের যত্নের মধ্যে ওয়াক্সিং-টাও পরে। এতে অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার হয় এবং ত্বকের মরা কোষ পরিষ্কার হয়। এর ফলে ত্বক উজ্জ্বল হয়। আজকাল হাত ও পায়ে 'সান ক্রিম' লাগাতে হয়, কারণ রোদের তাপে হাত ও পা ট্যান হয়ে যায়। হাত ও পায়ের আলাদা সান ক্রিম পাওয়া যায়। সবকিছুর সাথে হাত ও পায়ের যত্ন নিয়ে আপনি হয়ে উঠুন সর্বাঙ্গীন সুন্দরী।

একজনের ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে তার হাঁটা, চলা, বলায় ও পোশাকে। তাই ত্বকের বা মুখের যত্নের সাথে সাথে হাত ও পায়ের যত্ন অপরিহার্য। খাওয়ার দিকে নজর দিন, মন ভাল রাখুন।

নিজের রূপ পরিচর্যা বিষয়ে প্রশ্ন পাঠান sahac43@gmail.com এই ইমেলে

সেই দিনগুলি ছিল আমাদের ডুয়ার্সের মাটি দখলের লড়াই

ডুয়ার্সের সবুজ চা-বাগান, পাহাড়, পাহাড়ি ঝোরা, পাথুরে নদী, সবুজ অরণ্য ঘেরা, জনবসতিপূর্ণ, কর্মচঞ্চল, পর্যটন কাঠামোযুক্ত মহকুমা শহর 'মালবাজার'। বর্তমানে মালবাজারের পৌরসভার ১৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে বলা যেতেই পারে, ঠিক বুকের মাঝখানে ১ নং ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণ কলোনিতে আমার ছোট্ট অথচ শান্তিপ্রিয় বাসস্থান। দুই মেয়ে ও এক ছেলে যে যার মতো ভালোই আছে। আমাদের বাড়িতে কেবল আমি আর আমার স্বামী। এই রামকৃষ্ণ কলোনির জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে আমার জড়িয়ে থাকা স্মৃতির কথা বলতেই আজ কলম ধরা।

তখন ১৯৭৩-৭৪ সাল। পোস্ট অফিস, সুভাষিণী আদর্শ বিদ্যাভবনের উলটো দিকে ক্যালটেক্সের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে ৩১ নং জাতীয় সড়কের বাঁ দিকে ছিল রাজা-চা বাগানের অধীন এক খণ্ড অনুর্বর জলাজমি, যেখানে ছিল ঝোপজঙ্গল, আগাছা আর বড় বড় নলখাগড়ার ঘাস। আর ছিল বহু পুরনো বাগান— শ্রমিকদের পরিত্যক্ত আবাসের ভাঙাচোরা ভিতের আভাস যেখানে ছিল বিষাক্ত সাপখোপের আস্তানা। দিনের বেলাতেও সেখানে মানুষজনের খুব একটা যাতায়াত ছিল না।

ভাবলে এখনও বুক ঢিপঢিপ করে। সিনেমায় দেখেছি, গল্পে পড়েছি ডাকাতরা যেমন মশাল জ্বালিয়ে, বল্লম নিয়ে হইহই করতে করতে তেড়ে আসত, ঠিক সেইভাবেই দুই-তিনশো শ্রমিক মশাল জ্বালিয়ে, তিরধনুক নিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে। ওই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে আমরা মহিলারা ছেলেদের বললাম, পিছনে দাঁড়াতে...

আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে। স্বামী পিডব্লিউডি-তে কর্মরত, অফিস কোয়ার্টারেই থাকতাম। একদিন তিনি আমাকে এসে বললেন, বড় সড়কের পাশে চা-বাগানের কিছু জমি দখল হচ্ছে, আমাদের কয়েকজন কলিগ ওই জমি দখল নেবার প্ল্যান করেছে, আরও অনেক লোকজনও সঙ্গে আছে, আমার কলিগরা ওদের সঙ্গে আমাকেও যেতে বলছে, ভাবছি আমিও যাব, ভাগ্য সদয় থাকলে হয়ত জমির দখল পেয়ে যেতে পারি। সেই রাত থেকে জমিতে খুঁটি পুঁতে কয়েকদিন ধরে চলল পাহারা দেবার পালা। এইভাবে কিছুদিন চলার পর একদিন বাগান শ্রমিকরা লাঠিসোঁটা নিয়ে এসে জমি ছেড়ে দেবার জন্য ভয় দেখাতে লাগল। এরাও নাছোড়, কিছুতেই ছাড়বে না। এইভাবে চলল আরও কয়েকদিন। একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমি ও আরও কয়েকজন মহিলা, যাদের বাড়ির লোকেরা দখল নেবে বলে পাহারা দিচ্ছে, জায়গা দেখতে গিয়েছি, ছেলেরা তো আগে থাকতেই ওই জায়গায় ছিল। ভাবলে এখনও বুক ঢিপঢিপ করে। সিনেমায় দেখেছি, গল্পে পড়েছি ডাকাতরা যেমন মশাল জ্বালিয়ে, বল্লম নিয়ে হইহই করতে করতে তেড়ে আসত, ঠিক সেইভাবেই দুই-তিনশো শ্রমিক মশাল জ্বালিয়ে, তিরধনুক নিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে। ওই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে আমরা মহিলারা ছেলেদের বললাম, পিছনে দাঁড়াতে, তারপর রণচণ্ডী মূর্তির মতো দু'হাতে ছেলেদের আড়াল করে হিন্দিতেই বললাম, (তখন তো সাদরি ভাষা জানতাম না)— মারনা হ্যায় তো হম অউরত লোগোকো পহলে মারো, লেকিন হম জমিন সে নহি হটেঙ্গে, মর জায়েঙ্গে, ফিরভি ইক প্যার নহি হটেঙ্গে, হম তুম লোগোকো দুশমন নহি, ইয়ে খাস জমিন হ্যায়, হমারা ঘর নহি হ্যায়, ইসিলিয়ে ইধর মে হম ঘর বনায়েঙ্গে। আমাদের ওইরকম রণচণ্ডী মূর্তি দেখে, ওইরকম তিরধনুকের সামনে নির্ভয়ে কথা বলতে দেখে, ওরা নিজেদের মধ্যে কী সব আলোচনা করে আস্তে আস্তে চলে গেল।

এর কিছুদিনের মধ্যেই সবকিছু মিটমাট হয়ে গেল। এই জমি যারা দখল করতে এসেছিল, তাদের মধ্যে নানান পেশার সঙ্গে যুক্ত অনেকেই আবার নিজের দখল করা ভাগ সামান্য টাকায় বিক্রি করেও দিয়েছিল। অনেক ভদ্র, শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী মানুষ ওদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। তারপর সবাই মিলে বসে আলোচনার মাধ্যমে কলোনির নামকরণ করা হয় 'রামকৃষ্ণ কলোনি'। কিছুদিনের মধ্যে জমির পাকাপাকি পাট্টার ব্যবস্থার জন্য কয়েকজন মিলে টাকাপয়সা তুলে জলপাইগুড়ি গিয়ে আইনি কাজকর্মের মাধ্যমে অনেক চেষ্টা করে, জীবনভর বসবাসের পাট্টা মঞ্জুর করা হয়। যাঁরা এই আইনি কাজকর্মে সাহায্য করেছেন,

তাঁদের নাম না করলে অন্যায় হবে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষক জগদীশ বিশ্বাস, বিভূতি চক্রবর্তী, কৃষ্ণপদ বসাক, নারায়ণ সরকার, সাধন দত্ত-সহ আরও অনেকে। পরবর্তী সময়ে কলোনির মাঝখানে কালী মন্দির স্থাপন করা হয়। ছোটখাটো একটি ক্লাবও তৈরি করা হয়। সেই ক্লাবের সামনে আমরা প্রতি বছর মহিলারা উদ্যোগ নিয়ে বাসন্তী পুজোর আয়োজন করি।

আমি যখন ১৯৭৭-৭৮ সালে কোয়ার্টার ছেড়ে কলোনির বাড়িতে আসি, তখন আমি দু'টি কন্যাসন্তানের মা। কলোনিতে বিদ্যুৎব্যবস্থা ছিল না। কোয়ার্টারের লাইট, ফ্যান, জল ছেড়ে এসে এখানে এসে লণ্ঠনের আলোয় একেবারে নাজেহাল অবস্থা। সন্ধ্যা হতে হতেই শেয়ালের ডাক, নানারকম অদ্ভুত আওয়াজে হাড় হিম হয়ে যেত। তার উপর ছিঁচকে চোরের উপদ্রব, যদিও আমার বরাতে চোরবাবাজির সাক্ষাৎ ঘটেনি। কিন্তু অনেক অসুবিধে সত্ত্বেও এই ভেবে আনন্দ পেতাম যে, এ আমার বাড়ি, আমার নিজের অধিকারের বাড়ি, নিজের প্রতি নিজের

কোয়ার্টারের লাইট, ফ্যান, জল ছেড়ে এসে এখানে এসে লণ্ঠনের আলোয় একেবারে নাজেহাল অবস্থা। সন্ধ্যা হতে হতেই শেয়ালের ডাক, নানারকম অদ্ভুত আওয়াজে হাড় হিম হয়ে যেত। তার উপর ছিঁচকে চোরের উপদ্রব, যদিও আমার বরাতে চোরবাবাজির সাক্ষাৎ ঘটেনি। কিন্তু অনেক অসুবিধে সত্ত্বেও এই ভেবে আনন্দ পেতাম যে, এ আমার বাড়ি।

গর্ববোধ হওয়ার বাড়ি। এরও পাঁচ-ছ'বছর পর ইলেকট্রিসিটির কানেকশন নেওয়া হল। সেইসব পুরনো দিনের স্মৃতি হাতড়ালে মনটা কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

আজ আমার ছোট্ট দোতলা বাড়ির ব্যালকনিতে দাঁড়ালে দেখা যায় ফৌজিদের অন্তর্ভুক্ত বিশাল সবুজ মাঠ, সবুজ চা-বাগান, যে বাগান গিয়ে টুনাবাড়ি চা-বাগানের টিলাকে জড়িয়ে ধরেছে, ম্যানেজারের বাংলো, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা রিলায়েন্সের টাওয়ার। চা-বাগানের মাঝে মাঝে বড় বড় সবুজ গাছ, আর সেই গাছের ফাঁক দিয়ে একটু দূরে তাকালেই চোখে পড়ে যায় রেলগাড়ির লুকোচুরি। শোনা যায় তার হুইস্‌ল। মন ভরে যায় মেঘ-আকাশের খেলায় আর ভুটান পাহাড়ের তুষারশুভ্র শিখরের হাতছানিতে। কোকিলের কুহু, অচেনা-অজানা কত রকমারি পাখির কলতান বুকে নিয়ে ঘুমাতে যাই, আবার জাগি। প্রতিটা দিন আমি সবুজ ছুঁয়ে থাকি। জীবনের অনেকটা সময় সবুজকে এত কাছ থেকে পেয়ে এখন বুঝি, অন্য অনেকের চেয়ে আমি বেশ ভাল আছি।

উমা দত্ত, রামকৃষ্ণ কলোনি, মালবাজার

ভাবনা বাগান

সেই ছোটবেলা থেকেই জানি মেয়ের নাম 'যন্ত্রণা'

মেয়েবেলা যবে থেকে শুরু, মা বললেন, সাবধানে চলাফেরা করবি, ঘরে থাকতে শেখ। হাঁটুর উপর জামা পরা মানা তখন থেকেই। আরও যে কতরকম মশলাদার শাসন! শাসন ভাঙতে ইচ্ছে করত সব সময়। ঘুরে বেড়াতে আর আড্ডা মারতে ইচ্ছে করত খুব। বিশেষ করে আরও বেশি করে এসব করতে ইচ্ছে করত, যখনই ভাবতাম এসব শুধুমাত্র ছেলেদের জন্যেই। মেয়েরা ঘর গুছাবে, বাড়ি সাফ করবে, রান্না করবে, বাড়ির সকলে কে কী খাবে না খাবে, তার বন্দোবস্ত করবে... মনে হত, সব দায় যেন মেয়েদেরই। মায়ের উপর রাগ হত খুব। মনে হত, মা-ও বা কেন এসব মুখ বুজে করে এসেছে চিরকাল! ছোট্টবেলায় যখন রান্নাবাটি আর পুতুল হাতে পেয়েছি, তখন নিজের অজান্তেই মশগুল হয়েছি সেগুলো নিয়ে। কিন্তু বড় হয়ে মনে হয়েছে, কেন আমাদের গাড়ি কিনে দেওয়া হয়নি কিংবা ব্যাট-বল? রান্না করা আর সন্তান সামলানোর গুরুদায়িত্ব পালনের ট্রেনিং কি তাহলে তখন থেকেই শুরু? মেয়ে মানে ছেলে-বন্ধু একেবারেই না, মেয়ে মানে 'দিনকাল ভাল না', মেয়ে মানে কোনও আলাদা জগৎ।

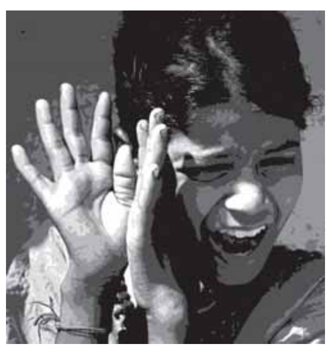

সমাজের লোলুপ দৃষ্টি আর নোংরা হাতের স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা শেখাতে গিয়ে দেওয়া হয়নি মাথা উঁচু করে চলার শিক্ষা। অভিভাবকত্বের খাঁচার ভিতর বন্দি থাকতে থাকতে একটা সময় হাঁপিয়ে পড়তে হয়। আমি সাহিত্য নিয়ে পড়তে চাই, বলা হল, বিজ্ঞান নিয়ে পড়। আমি বিজ্ঞান ভালবাসলে হয়ত বলা হত, সাহিত্য পড়। আমি গ্রামের মেয়ে, শহরে গিয়ে পড়তে হলে আমি পেরে উঠব না। কারণ, আমি মেয়ে-সন্তান। মূল কথাটা হল, আমার জন্য পড়াশোনাটাও গৌণ। টুকরো টুকরো হয়ে যায় ছোট্টবেলা থেকে লালন করা স্বপ্নগুলো। বড় হওয়ার স্বপ্ন, কিছু করে দেখানোর স্বপ্ন। ১৮ পেরনোর পরই পাত্রপক্ষের সামনে ইন্টারভিউতে বসার শুরু। এ পরীক্ষা অন্যান্য সকল পরীক্ষার চেয়ে কঠিন। পাশ করলে অচেনা-অজানা একটি মানুষের হাত ধরে সমস্ত শখ-আহ্লাদকে পিছনে ফেলে অন্য একটি সংসারকে সামলানোর দায়িত্ব ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কাঁধে নিয়ে চলে যেতে হয় চোখের জলে ভিজতে ভিজতে। মেয়ে-জীবন এমনটাই।

আজকাল ছবিটা খানিকটা হলেও পালটেছে। আরও পালটাক। ধর্ষিত হওয়া মেয়েটি এখন আর মুখ বুজে শুধু যন্ত্রণা সহ্য করে যায় না। পড়াশোনার জন্য আজকাল অনেক মেয়েই আর বাধ্য পুতুলের মতো ঘরে বসে থাকে না। পাত্রপক্ষের সামনে দফায় দফায় মাথা নিচু করে বসে বহু মেয়েই আর নিজেকে নগণ্য প্রতিপন্ন করতে রাজি নয়। প্রতিবাদের স্বর আরও চড়া হোক। বুকের ভিতর আগুন জ্বলুক। তাহলে হয়ত একটু একটু করে হলেও মেয়েরা তাদের জায়গা দখল করে নেবেই। 'অধিকার কেড়ে নিতে হয়।'

উইনি রায় কুণ্ডু, জলপাইগুড়ি

বর্ষায় ডুয়ার্সের নদী দেখে যজুর্বেদের কথা মনে পড়ে

ডিমা। মেলাঙ্গি। বীরপাড়াঝোরা। তোর্সা। ঘাটিয়া। কুর্তি ঝোরা। সুখানি ঝোরা। জলঢাকা। মূর্তি। কুর্তি। নেওড়া। মাল। তুন বারি। সুখা ঝোরা। চৈতি। চেল। ঘিস। জুরন্তি নালা। লিস। দোলং। এরা সবাই নদী। ডুয়ার্সের নদী। গুগ্‌ল ম্যাপে দেখলে মনে হবে, যেন কোনও গুপ্তধনের ম্যাপ। অতর্কিতে জল ঢুকে পড়ছে অজানা কোনও দ্বীপে। এঁকে ফেলছে বিচিত্র সব জলছবি নিজের মতো করে।

যেন অসতর্ক হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গিয়েছে দোয়াত। নীল কালি ছড়িয়ে যাচ্ছে। গড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে। ডুয়ার্সের এলোমেলো ছোট নদীগুলো ধমনির মতো, শিরা-উপশিরার মতো এগিয়ে যাচ্ছে সর্পিল পথ ধরে। এঁকেবেঁকে পৌঁছে যাচ্ছে চেংমারি থেকে ধূপঝোরায়। সানতালেবাড়ি থেকে মাদারিহাটে। চিকলিগুড়ি থেকে ভেটাগুড়িতে। প্যারন থেকে মথুরা চা-বাগানে। সেই নদীজলের কী অপরূপ রূপ! সাধে কি আর যজুর্বেদ নদীজলকে স্তুতি করেছে 'সূর্যত্বচসা' বলে! সূর্যত্বচসা অর্থাৎ সূর্যরশ্মির মতো ত্বক যার। বলেছে 'সূর্যবচসা', যার অর্থ সূর্যের মতো বাক্য-ধ্বনি যার। ডুয়ার্সের বর্ষাস্নাত নদী দেখে যজুর্বেদের কথা মনে পড়বে— এতে আর আশ্চর্যর কী!

সময়ের কাক বসে আছে মুখ গুঁজে। মন কেমন করা ঘুড়ি মেঘলা আকাশে উড়তে থাকে পতপত করে। কিছু ঘুড়ি হাত ফসকে পালায়। কিছু আটকে থাকে আদ্যিকালের অ্যান্টেনাতে। বাইরে বেসামাল বৃষ্টি। দূরে কোথাও একটা নিঝুম ঘরে আলো জ্বলছে। কোনও একজনের পড়ার ঘর। একটা অসমান টেবিল। তার উপর গাদাগুচ্ছের বই রাখা। কাঠের চেয়ারে বসে আছে কেউ। এক ঢাল চুল। টিকালো নাক। ভাসা ভাসা চোখ। খোলা জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ছে বৃষ্টির ছাট। ভাঙাচোরা দুঃখী একটা গলি দাঁড়িয়ে আছে সেই ঘরের বাইরে। তার মধ্যেই নিয়ম করে লোডশেডিং। মোমের আলো আর লাল রিবনের সন্ধে। টিনের চালে অবিরাম ধারাপাত। চায়ের কাপ থেকে চলকে পড়া চা ভিজিয়ে দিচ্ছে থিন অ্যারোরুট বিস্কুট।

ওই নেতিয়ে পড়া বিস্কুটের মতোই ছিল ডুয়ার্সের সেইসব দিন। তার কিছুটা শুকনো। কিছুটা ভিজে। ছেলেবেলার রোদ্দুরের মতো। তুলতে গেলে খানিকটা ওঠে। খানিকটা রয়ে যায় প্লেটে। স্কুল ছুটি হতে না হতেই এক হাঁটু। হাতে টিনের সুটকেস। 'নটি বয়' ছাপিয়ে জল। পাঁক, ময়লা, নোংরা প্লাস্টিক মাখা দুরন্ত জল। প্লাস্টিকের পরদা টানা রিকশা চলে গেল একটা। সে কারণেই জলে অল্প ঢেউ দিচ্ছে। ছুঁয়ে ফেলছে হাফ প্যান্টের সমুদ্রতীর। মহানন্দে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে বাড়ি ফিরছে একদল দস্যি ছেলে। কিছু একটা মুখে গুঁজে বেরিয়ে পড়ছে আবার। পাড়ার মোড়ে দাদাদের গলাবাজি। রেডিয়োতে মোহনবাগান-ইস্ট বেঙ্গল। এসবের মধ্যেই এক বর্ষামেদুর সন্ধ্যায় সেই বিশেষ বাড়িটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এক কিশোর। ধুকপুক বুক। ইটের টুকরো হাতে নেয়। আঁকবাঁকা অক্ষরে লিখে দেয়— এসেছিলাম। এমনিই।

স্মৃতির বর্ষাতি গায়ে দিয়ে নস্টালজিয়ার স্যাঁতসেঁতে গলিপথে আনাগোনা চলে। মন ফিরে যায় নির্জন এক জনপদে, যেখানে এখনও অমলিন শৈশব কিংবা কৈশোর তার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। নির্জন পাহাড়, জনহীন জঙ্গল, অসম্ভব সব বর্ষাকালে যাঁদের দিন গুজরান হয়েছে, তাঁরাই বুঝবেন এর মর্ম। একটা সময়ের পর ফেলে আসা দিনের রেলপথ ধরে এক্কাদোক্কা খেলতে খেলতে

তিস্তা, জলঢাকা, সংকোশ, তোর্সা, কালজানি, রায়ডাকের কাছে ফিরে আসাই বোধহয় ডুয়ার্সের মানুষের নিয়তি।

ঈশ্বর তাঁর নিজস্ব ইজেল থেকে সবুজের নানরকম শেড দিয়ে এঁকেছেন জায়গাটিকে। প্রলয়ংকরী নদীর প্রবল স্রোতের দিকে তাকিয়ে চোখে ঘোর লাগে। গর্জন করে বয়ে চলা জলে ওপাশের বাঁশবন, গাছবনের নিবিড় ছায়া পিছলে পিছলে যায়। গাছপালার ছায়ান্ধকারে সন্ধে ঘনিয়ে আসে। এই সঘন সজল বর্ষায় এক আশ্চর্য ভ্রমণে মন ছুটে যায়।

কী নদী এটা? রায়ডাক। রেল ব্রিজে ওঠার মুখে বোর্ডে যে নাম লেখা থাকে নদীর, সড়কপথে সব জায়গায় তা থাকে না কেন? নদীরাই তো ভূভাগের উপর প্রকৃতির নিজের বহু যত্নে এঁকে দেওয়া চিহ্ন, অঞ্চলটিকে যা দিয়ে চিনে নেওয়া যায়। এই যেমন নদীর ওপারে বাঁশবনের ঘন ছায়া ঢাকা সবুজ টানেলের মতো পথ পার হয়ে, শালগোড়া পেরিয়ে, বোচামারি মোড় পার হয়েই এসে পড়ে রসিক বিল। পাঁচ ভাগে আলাদা আলাদা নামে চিহ্নিত এই স্বাভাবিক জলাভূমির নাম হল রসিক বিল, নীল ডোবা, বোচামারি, রাইচাংমারি, শঙ্খমারি।

অন্য সময় জল তেমন গভীর নয়। তবে এই বর্ষায় তার অন্য রূপ। নারীর গহন মনের মতো অতল তার জল। আশপাশের অনেকখানি বিস্তৃত এলাকার বৃষ্টির জল এই নিচু এলাকাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে এসে জমা হয়। প্রচুর ফলের গাছ চারপাশে। কলা গাছের বন, বাঁশঝাড়। পশ্চিম দিকে ফরেস্টের কটেজ। ডর্মিটরি। দক্ষিণে গাড়ি চলাচলের রাস্তা। কামাখ্যাগুড়ি হয়ে সে পথ চলে গিয়েছে আসামের দিকে। বিলের বাকি অংশে তিনটি গ্রাম। তাদের মধ্যে মধ্যে নানারকম বৃক্ষ। গুল্ম, ঘাস। পঁচিশ কেজি ওজনের শাল মাছ ঘাই মারে বিলের জলে। কেবল মাছ বা জলজ গুল্ম বা ফল খাওয়াই নয়। ব্রতগান, কাছাকাছি এলাকার জল ও গাছপালা— সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই বিস্তৃত জলাভূমি। ঝাঁক ঝাঁক বেগুনি শালুক ফুটে আছে সেই জলে।

বিল লাগোয়া গ্রামের নাম চিংটিমারি। নানারকম লোকের বাস। আদিবাসী, রাজবংশী, বাঙালি। গা-ঘেঁষাঘেঁষি ঘর। মাছ ধরে বিক্রি করে অনেকে। কিছু জমিও আছে। চাষ ভালই হয়। নানা জায়গা থেকে উচ্ছেদ হয়ে আসা মানুষের গ্রাম এটা। স্থানীয় রাজবংশী মানুষরা চাষ করেন। শান্ত, নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকা তাঁদের জীবন। এখানে নাকি বিয়ের সময় পুকুরের জলে কলা গাছের খোলার দুটো সজ্জিত নৌকা ভাসিয়ে পুরো গ্রাম মশাল আর প্রদীপের আলোয় লক্ষ করে নৌকা দু'টি কাছাকাছি গেল কি না। তাহলে সুখের হবে বর-কনের যৌথ জীবন। ভাসানোর কাজটা যিনি করেন, সেই বিবাহিতা মহিলাকে বলা হয় 'বৈখরী'। বিয়েতে তাঁর গুরুত্ব অনেক। বাঙালি বিয়েতে এই আচার আমরা দেখে অভ্যস্ত। সেখানে গামলার জলই হল পুকুর। ভেবে অবাক লাগে, কতরকম করে জল জড়িয়ে রেখেছে ডুয়ার্সের সংস্কৃতিকে।

বর্ষার ডুয়ার্স এভাবেই বিহ্বল করে রাখে। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করিয়ে দেয়। মাথা নিচু করে ভাবতে শেখায়— প্রাচীন সুন্দর সুসভ্য বর্ণময় সমাজ থেকে কী করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম আমরা। কী করে এসে পৌঁছালাম এই স্বজনহীন, প্রেমহীন, বস্তুবহুল খণ্ড খণ্ড হতে থাকা নাগরিক জীবনে!

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

ছবি: প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

৪০ শতাংশ ছাড়

বর্ষায় ডুয়ার্সে মোহিনী রূপ উপভোগ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম এবার দিচ্ছে অভাবনীয় ছাড়। মূর্তি, জলদাপাড়া ও জয়ন্তী টুরিস্ট লজে ঘরভাড়ার ওপরে ৪০ শতাংশ ছাড় দিচ্ছে নিগম। বুকিং অনলাইনে কিংবা অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে। ফোন: ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬।

রেইকির মাধ্যমে ইচ্ছাশক্তি বাড়িয়ে নীরোগ থাকার পথ

প্রাচীনকালে জাপানে যে আধ্যাত্মিক স্পর্শ চিকিৎসার প্রচলন ছিল তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যায়। আজ থেকে বহু বছর আগে ডক্টর মিকাও ইউসুই নামে এক মহাত্মা এটি পুনরাবিষ্কারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে আসেন। কাহিনিটি অনেকটা এরকম— ধর্মমতে খ্রিস্টান হওয়ার ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়তে পড়তে কৌতূহল জাগে মিকাও ইউসুইয়ের মনে, যিশুর যে স্পর্শ করে অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলে আমরা জানি, তার পিছনের বিজ্ঞানটা আসলে কী, সেটা জানতে হবে। চার্চের ফাদারের কাছে উত্তর চাইতে গেলেন বটে, কিন্তু হতাশ হলেন। তখন নিজেই বেরিয়ে পড়লেন এই বিশেষ শক্তির উৎস সন্ধানে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে অবশেষে ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীদের কাছে এসে উত্তর মিলল বটে, কিন্তু মতের অমিল হল। মিকাও চাইলেন, পর্বতশিখরে ধ্যানে বসে যে শিক্ষা তিনি অর্জন করলেন তা ছড়িয়ে দিতে হবে পৃথিবীর সর্বত্র। স্পর্শ দিয়ে চিকিৎসাপদ্ধতির মাধ্যমে একটি নীরোগ ধরিত্রীর জন্ম দেবেন তিনি। তাঁর সে সৎ প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের হাত ধরে। এই পদ্ধতিই পরিচিত হল 'রেইকি' হিসেবে। শুধু জাপানেই নয়, এখন সারা পৃথিবীতেই রেইকির প্রচলন হয়েছে। দেশানুসারে এর ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হয়েছে। যেমন ভারতে 'প্রাণ', চিনে 'চি', মুসলিম দেশে 'বর্ক', রাশিয়ায় 'রায়প্লাজমা' ইত্যাদি। নাম যা-ই হোক, পদ্ধতি আসলে একই।

ডক্টর ইউসুই এই পদ্ধতি আবিষ্কারের

মধ্যে দিয়ে এমন একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তির তরঙ্গ খুঁজে বার করেছেন, যা মানুষের হাত ও করতলের মধ্যে দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়। এই বিচ্ছুরণ বিভিন্ন রোগকে দূর করতে সক্ষম। এই তরঙ্গ রোগীকে স্পর্শ না করেও দূরে কোথাও বসেও রোগীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

রেইকি একটি জাপানি কথা। 'রে' ও 'কি'— এই দু'টি অক্ষর বা শব্দ দিয়ে তৈরি। জাপানি ভাষায় 'রে' শব্দের অর্থ হল সার্বভৌমতা, যার গূঢ় অর্থ হল বুদ্ধিমত্তা। 'কি' শব্দের অর্থ হল জীবনীশক্তি বা জৈব শক্তি। রেইকি একটি শক্তি। এই শক্তি জীবদেহের অন্যতম শক্তি হলেও সাধারণভাবে এর প্রয়োগ সম্পর্কে আমরা বিশেষভাবে অবগত নই। তাই এই শক্তির ব্যবহারিক দিকটির প্রশিক্ষণ নেওয়া দরকার। মনের ইচ্ছাশক্তিকে বৃদ্ধি করে এবং তাকে অপরের দেহে সমাবিষ্ট করে রোগীকে নীরোগ করে তোলা যায়। ইচ্ছাশক্তি আমাদের সবার মধ্যেই রয়েছে, কিন্তু আমরা তার প্রয়োগ জানি না বলে তাকে ব্যবহার করতে পারি না। রেইকির মাধ্যমে সেই ইচ্ছাশক্তিকে সুদৃঢ় ও সুসংবদ্ধ করে নিয়ে কাজে লাগানো যায়।

তিব্বতিরা হাজার হাজার বছর আগে প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মনের ভিতরের শক্তিকে জাগিয়ে তুলে রোগকে জয় করত। কিন্তু এই পদ্ধতি শুধু গুরু-শিষ্য পরম্পরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে এই চিকিৎসার কোনও লিখিত নথি তৈরি করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা প্রয়োজনও অনুভব করেননি। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ডক্টর মিকাও ইউসুই দীর্ঘ গবেষণা চালিয়ে এই পদ্ধতির পুনরাবিষ্কার করেন।

রেইকি নিয়ে প্রতিবেদন করার উদ্দেশ্যে স্বচক্ষে দেখতে গিয়েছিলাম জলপাইগুড়ির নতুনপাড়ার একটি সেন্টারে চলতে থাকা ট্রেনিং প্রোগ্রাম। সকলের শ্রদ্ধেয় রনুদাকে দেখে অবাক লেগেছিল। স্তিতধী এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব মুগ্ধ করেছিল আমায়। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান রেইকিকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে।

একজন ক্যানসার পেশেন্টকে দেখলাম, যিনি ব্রেস্টে লাম্প ধরা পড়ার পর ম্যামোগ্রাফির খরচ, অপারেশনের খরচ সামলানোর ক্ষমতার বাইরে ছিলেন, উপায় না দেখে কয়েক মাস ধরে রেইকির সাহায্য নেন। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। তাই ধৈর্য না হারিয়ে লেগে থাকেন দীর্ঘ মাস ছয়েক। ফের যখন ডাক্তার দেখান, দেখা যায় তাঁর লাম্প হাওয়া! কী করে হল? বুঝলেন রেইকির ফল। তাই আর এ অভ্যাস থেকে দূরে যাওয়ার কথা ভাবেনইনি। এরকম ভূরি ভূরি অসুখের উদাহরণ দেখলাম ট্রেনিং সেন্টারটির ট্রেনিদের মধ্যে। শুধু শারীরিক অসুখবিসুখই নয়, মানসিক ব্যাধি, মনোযোগের অভাব, এমনকি সাংসারিক গোলযোগ— সব কিছুই মিটে যাচ্ছে অবলীলায়। কী করে সম্ভব তা নিজেরাই পরখ করে দেখতে পারেন পাঠকবর্গ। বিশ্বাস আর ধৈর্য— এ দুটোই এ চিকিৎসার প্রধান দু'টি স্তম্ভ, সেই সঙ্গে দরকার নির্ভুল পথপ্রদর্শন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ

উপভোক্তার অধিকার প্রয়োগ করুন,
প্রতিকার লাভে উদ্যোগী হন।

সচেতন ক্রেতাই সুরক্ষিত ক্রেতা

জিনিস পত্র কেনাকাটা অথবা ব্যাঙ্ক, বীমা, বিদ্যুৎ, ডাক, চিকিৎসা, নার্সিংহোম ইত্যাদি পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায় ঃ-

সহ-অধিকর্তা
উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার
জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়
জেলা প্রশাসনিক ভবন (৩য় তল), জলপাইগুড়ি, ফোন এন্ড ফ্যাক্স ঃ- ০৩৫৬১-২২৫৭৬৪

কনজ্যুমার হেল্প লাইন নং-১৮০০-৩৪৫-২৮০৮(টোল ফ্রি) ওয়েব সাইট-www.wbconsumers.gov.in

ABACUS & Brain Gym

A Brain Development Training for your Child

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকশিত হবে ঃ

- অংকে পারদর্শিতা
- মনোযোগ
- স্মরণশক্তি
- আত্মবিশ্বাস
- কল্পনাশক্তি
- আত্মনির্ভরশীলতা
- উপস্থিত বুদ্ধি
- উপস্থাপনা
- মেধা ও প্রতিভা
- গতি ও নির্ভুলতা

Age 4 to 13 yrs

Learn Science Through Hands-on-Activity.

FUN SCIENCE LAB

EXPERIENCE SCIENCE... HANDS-ON !

More than 35 Science Activities & Experiments...

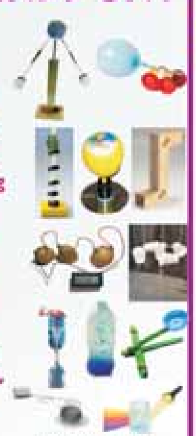

- Air
- Water
- Sound
- Light
- Magnetism
- Force
- Energy
- Balancing
- Solar System
- Human Body

Lemon & Potato Battery, Periscope, Balancing Doll, String Phone, Jumping Frog Sun Dial, Rainbow Jar , Lava Lamp, Water Cycle in a Bag, Balloon Car, Invisible Ink ,Soap Boat, Catapult, Hovercraft, Anemometer, Fountain in Bottle, Solar System Model, Seed germination and many more...

20 Sunday program... Every Sunday 2 hours

Only for the student of Class III to V

All Material given on Take-Home basis

ENGLISH LEARNING PROGRAM FOR ALL AGE GROUP

SpeakWell

Enabling You to Speak English Confidently & Fluently

Reading · Writting · Listening · Speaking

Starter

AGE 4 to 7

- ✓ PHONICS & READING.
- ✓ SPEAK FLUENTLY.
- ✓ GRAMMAR & SENTENCES.
- ✓ CONVERSATION SKILLS.
- ✓ SPELLING & VOCABULARY.
- ✓ WRITING & TYPING.
- ✓ BECOME AN INDEPENDENT READER.

Junior	Active	Fluent
Age 8 to 12	Age 13 to 17	Age 18+

Vedic Mathematics

an ancient system for fast & easy calculation

কিছু কৌশল যা অংককে আরও তাড়াতাড়ি সমাধান করতে সাহায্য করে।

Your Child can solve these mentally?

2679502/43 in 12 secs

1412 × 14 in 5 secs

18% of 120 in 4 secs

$(965)^2$ in 5 secs

$\sqrt[3]{11852352}$ in 20 secs

Age 12+

Addition, Subtraction, Multiplication, Division, Percentage, L.C.M, H.C.F, Square & Cube Roots All In 30 Seconds.

ABACUS TEACHER'S TRAINING

We are offering excellent opportunity to associate and earn throughout your life by training children...

Ideal for Educated Housewives, Graduates, Unemployed or any Energetic individuals...

✓ No Franchise Fee. ✓ High Earning Potential.
✓ Break Even Starts Within 3 to 6 Months.

Contact Us to Join FREE WorkShop or DEMO Class

99330 21080 / 97320 00665

SCA STAR CAREER ACADEMY

Charuprobha Bhawan, KADAMTALA, JALPAIGURI

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.